Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

শ্রমজীবী জনসমষ্টির স্বদেশ বলে কোন বস্তুই নেই, যা তাদের আদপেই নেই তা থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করতে পারিনা। যেহেতু সর্বহারাদের সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির অগ্রচারী শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে হবে একক জাতিরূপে, সে অর্থে তাদের চারিত্রবৈশিষ্ট্যই জাতীয়—

—কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১
পবঙ্গে ডবল ইঞ্জিনের সরকার... ১
২০২১ সংযুক্ত মোর্চার আবেদন ২
মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী ৩
মোদী.... ফ্যাসিবাদ সাধনা ৫
মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ৭
দূরদর্শন, আকাশবাণীতে সম্প্রচার নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ৮

68th Year 31th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 27th March 2021

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীতে নরেন্দ্র মোদীর স্বঘোষিত মিথ্যাচার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুবেলা অসত্য উচ্চারণ করতে করতে এত বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তালজ্ঞান মাত্রা শূন্য হয়ে নিজের ঢাক নিজেই বাজালেন। কোনো শক্তির অমানবিক কাজকর্মের পিছনে যে দুরভিসন্ধি ও স্বার্থান্বেষী নীতির তাগিদ থাকে, তার বিরুদ্ধে নাকি যৌথ সংগ্রামে তিনি এক ভারতপথিক। এমনকি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে প্রতিবাদী সংগ্রামে মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি কারাবরণও করেছিলেন।

সাজিয়ে গুছিয়ে অর্ধসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলে প্রচার করায় নরেন্দ্র মোদীর জুড়ি নেই। বিশেষ করে, যেহেতু তাঁর কাছে গণতন্ত্রের একটিই অর্থ, অর্থাৎ মিথ্যাপ্রচার, কর্পোরেট অর্থের বন্যা, বিভিন্ন খণ্ডিত পরিচয় সত্তা ও সাম্প্রদায়িকতা নির্ভর ভোটব্যাঙ্কের প্রয়োজন। সুতরাং বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে এই কূটনৈতিক সন্ধিক্ষণটাকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রচারের স্বার্থে এরাজ্যের মতুয়া সম্প্রদায় সহ সমগ্র বাঙালী জাতির 'মুক্তিযুদ্ধে'র ভাবপ্রবণতাকে কাজে লাগাবেন না, তা আশা করাই যায় না গোয়েবেলস-গোয়েরিং হিটলারের আদর্শ শিষ্যের কাছে।

বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রজন্মের নাগরিকদের কাছে উদাত্তকণ্ঠে বলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে তিনি নাকি সত্যাগ্রহ পালন এবং কারাবাস করেছেন। এ তাঁর তারুণ্যের গর্বের বিষয়।

তাঁর প্রথমবার এই আত্মশ্লাঘার বিষয় উচ্চারণের প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তৎকালীন জনসংঘের নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১ অগস্ট থেকে ১১ অগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবস্থান প্রসঙ্গে সত্যাগ্রহ এবং ১২ অগস্ট মিছিল সংঘটিত হয়। সম্ভবত সেই সত্যাগ্রহ এবং মিছিলে গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনাটাই স্মৃতির উই-এর ঢিপি খুঁড়ে পুনরুদ্ধার করেছেন আত্মগর্বী ও বাক্যপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী।

জনসংঘের আন্দোলন সেদিন, সমগ্র ভারতবাসী এবং ভারত সরকারের রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও সংঘ পরিবারের স্বভাবজ সামরিক পাকিস্তান বিরোধী জঙ্গি রণনীতির অনুপ্রেরণায় চালিত হয়েছিল। ১৯৭১ এর মার্চ-এপ্রিল থেকে ভারত সরকার যথেষ্ট সামরিক প্রস্তুতি এবং এক কোটিরও বেশি বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ব্যস্ত ছিল। জনসংঘের বক্তব্য ছিল, সেদিন পাকিস্তানের পক্ষে আমেরিকার সি আই এ এবং চিনের সমর্থন থাকলেও অবিলম্বে সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তি না করেই পাকিস্তানের প্রতিরোধে যুদ্ধ শুরু করা উচিত। আত্মবিনাশী সেই প্রস্তাব ও জনসংঘী রণনীতি এই উপমহাদেশের কি বিপর্যয় যে ডেকে আনত আজ তা সহজেই অনুমেয়।

সেই ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক সংকটকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পি এন হাকসারের রচিত মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনের খসড়া প্রথমে সংসদে অনুমোদিত হয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তাবে সেই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতাবৃন্দ যথা পি এন হাকসার, অশোক মিত্র প্রমুখ আরো প্রস্তুতি এবং রাষ্ট্রসংঘে ভারতের অবস্থানের পক্ষে সম্মতি নির্মাণের সুপারিশ করেন। আর মাত্র কয়েক মাস পরে অগস্ট মাসেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা অশোক মিত্র, দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্স এর অধ্যাপক অমর্ত্য সেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ আনিসুর রহমান, রহমান সোভিন প্রমুখ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীবৃন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রণনীতিগত চুক্তির বিষয়ে ভারত সরকারকে সম্মত হওয়ার পক্ষে ইতিবাচক বিষয়গুলি তুলে ধরেন।

ঠিক সেই অগস্ট মাসেই বিজেপি'র পূর্বসূরি জনসংঘ ভারত-সোভিয়েত চুক্তিটির বিরোধিতা করতেই সত্যাগ্রহ এবং মিছিল সংঘটিত করে। ঐতিহাসিক বিচারে সেদিনের অটল বিহারী বাজপেয়ী, নরেন্দ্র মোদীদের আন্দোলন এক আত্মঘাতী দেশদ্রোহিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সেই অর্ধসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতেই নির্লজ্জের মতো মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বুক বাজিয়ে অগ্রসারি ভারত পথিকের গল্প শোনাচ্ছেন। ইতিহাসই বিচার করবে। মিথ্যাচারের অনুশীলনে নরেন্দ্র মোদীর উত্থান প্রহসন না ট্রাজেডী।

রাজ্যের সর্বনাশে উদ্যত বিজেপি-টিএমসি

ডবল ইঞ্জিনের সরকার গঠনের ভয়াবহ আবেদন বিজেপি'র!

কেন্দ্র এবং রাজ্য একই দলের শাসন থাকলে উন্নয়নের গতি বাড়বে চড় চড় করে। এমনই উদ্ভট দাবি করছেন বিজেপি নেতৃত্ব। ভাবটা এমনই যে ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে বিজেপি সরকারগুলি অসাধারণ উন্নয়নের নজির সৃষ্টি করেছে!

ত্রিপুরায় নির্বাচনের আগে বিজেপি'র প্রতিশ্রুতি ছিল সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়া হবে। নেতারা বলেছিলেন, বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হবেন। শিক্ষকদের উপার্জন বাড়বে। বাস্তবে বিগত দুই বছরে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির উল্টো পথেই হাঁটছে বিজেপি সরকার। ডিএ আদৌ বাড়ে নি। শিক্ষকশূন্য বিদ্যালয়গুলিতে কোনো শিক্ষিত যুবক যুবতীর শিক্ষকপদে চাকুরি হয় নি। উল্টে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নিযুক্ত দশ হাজার শিক্ষকের স্থায়ী চাকুরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ডবল ইঞ্জিনের অশেষ কৃপায় নতুন চাকরির ব্যবস্থা দূর স্থান। স্থায়ী চাকুরেদের বিনা কারণে জীবিকাচ্যুত করা হয়েছে।

চাকুরি হারানো শিক্ষকরা এমন গর্হিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে পথে নেমে প্রতিবাদ করতে গেলে রাজ্য পুলিশ নৃশংসভাবে সেই মিছিলের ওপর আক্রমণ শানিত করে। বহু শিক্ষক শিক্ষিকা আহত। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদ পত্র দেবার গণতান্ত্রিক অধিকার পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিজেপি জমানায় ত্রিপুরা রাজ্যের অবনমন অকল্পনীয়। সেসবের ব্যাখ্যা দেবার তেমন প্রয়োজনীয়তা নেই। সবই ডবল ইঞ্জিনের দৌলতে!

ডবল ইঞ্জিন সরকার উত্তর প্রদেশে চলছে। হাথরস, উন্নাও, বদাঁয়ু সহ এই রাজ্যের প্রায় সর্বত্র নারীসমাজ আক্রান্ত। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে নজর করলেই স্পষ্ট উপলব্ধি করা সম্ভব যে, বিজেপি'র ডবল ইঞ্জিন পশ্চাদপদ জাতির মেয়েদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে চলেছে প্রতিদিন। ধর্ষণ করে খুন করে ফেলা কোনো ব্যাপারই নয় এই রাজ্যে। সরকার নির্বিকার। আইনের শাসন বিপর্যস্ত। দলিত কন্যারা বয়স নির্বিশেষে উচ্চজাতির নারকীয় লালসার শিকার। উদাহরণ অজস্র। রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন একচক্ষু আচরণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর। বেকারত্বের ভয়াবহ সমস্যা সারা দেশের মতো এই রাজ্যের জনজীবনকেও বিধ্বস্ত করে চলেছে। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই অধোগতি অব্যাহত।

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণে অতি তৎপর রাজ্য সরকার। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মূল পৃষ্ঠপোষক এবং উৎসাহদাতা। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রকে মিলিয়ে দিয়ে এক চরম উগ্র সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। সাধারণ প্রশাসনও এক অচল অবস্থায়। অন্যদের মন্তব্য উল্লেখ না করে শুধু দেশে শীর্ষতম বিচারালয় সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্যটিই যথেষ্ট। বিচারকদের মতে, উত্তর প্রদেশকে সংশোধনাতীত এক দুর্বৃত্ত শাসিত রাজ্য। সেই হিসেবেই উল্লেখ করেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। ডবল ইঞ্জিনের অপার মহিমা!

এখন পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। এই দলটি রাজ্যের সামুহিক সর্বনাশ করেছে। ২০১১ থেকেই নারী সমাজের ওপর নারকীয় অত্যাচার চলেছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান উত্তরপ্রদেশ সরকারের মতোই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা ন্যক্কারজনক। তিন বছরের শিশুকন্যা থেকে তিয়াত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধারাও পরিত্রাণ পান নি। খুন হয়েছেন এবং হয়ে চলেছেন অগণিত নারী। রাজ্য সরকার প্রচার করছে 'নিজের মেয়েকেই চাই'। এমন ভাবে মেয়েদের ধারাবাহিক সর্বনাশ করার প্রকল্পকেই চালিয়ে যাবেন সেই 'মেয়ে'।

রাজ্যের সামাজিক পরিস্থিতি সর্বনিম্ন স্তরে অবনমিত। এমন সব পাপ ডবল ইঞ্জিনের সরকার হলে যে আরও বহুগুণ বাড়বে তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কর্মহীনতা এক ভয়াবহ আকারে যুবজীবনকে আচ্ছন্ন করেছে।

উত্তর প্রদেশের পিলিভিট। নারী অধিকার নিয়ে অনেক কথা বলতেন মানেকা গান্ধি। তিনি আবার বহু মানুষের সর্বনাশ করা প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধির পত্নী। এখন বেশ কিছুকাল যাবৎ বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বলে দাবি করা বিজেপি'র নেত্রী। দীর্ঘকাল পিলিভিটের সাংসদ ও দেশের মন্ত্রী থেকেছেন। অতীতের অনেক কথা বাদ দিলেও সদ্য সেদিন ১৮ এবং ২০ বছরের দুই কন্যার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল। একজন হতভাগিনী গাছের ডালে ঝুলছেন অন্যজনের মৃতদেহ কাছেই মাঠের ওপর।

পরিবার ও স্থানীয়দের স্পষ্ট অভিযোগ এই দুইজন তরুণীকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। রিপোর্টে প্রকাশ যে, দুই বোন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে জঙ্গলের ধারে গিয়েছিলেন। দুর্বৃত্তরা সেখান থেকেই তাঁদের অপহরণ করে মনুষ্যেতর কুকীর্তি করে। দরিদ্র পরিবারের দুই বোন। পুলিশের কাছে নালিশ জানাতে গেলে পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা নিয়মে পরিণত। সমস্ত দেহ জুড়ে নৃশংস নিপীড়নের স্পষ্ট চিহ্ন থাকলেও পুলিশ তাদের অকর্মণ্যতা এবং রাজ্য সরকারের গোপন নির্দেশে তদন্তে নেমে এক অলীক অভিযোগে নির্যাতিতা এবং নিহতদের পরিবারকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো উত্তরপ্রদেশেও এটা নিয়মে পরিণত। অভিযুক্তদের সহায়তা করাই পুলিশের কর্তব্য।

প্রকৃত তদন্ত না করেই উত্তরপ্রদেশ পুলিশ 'অনার কিলিং' বা পারিবারিক সম্মানরক্ষার্থে এই দুই তরুণীকে খুন করা হয়েছে বলে তাঁদের দাদাকে তাড়া করছে রাজ্যের আইন রক্ষকরা। অসহায় পরিবার তাদের কন্যাশোক ভুলে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত। রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার। তার দৌলতেই নারীসমাজ চরম বিধ্বস্ত।

এরপর ৪-এর পাতায়

পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে সংযুক্ত মোর্চার আবেদন

বন্ধুগণ,

- সপ্তদশ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেছে। আমরা সকলেই অবহিত যে বিগত এক বছরের অধিক সময়কাল ধরে করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে সমগ্র মানব সভ্যতার সংগ্রাম চলছে। সমস্ত ধরনের সতর্কতা মান্য করেই দৈনন্দিন জীবন, লড়াই-সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী ২৭শে মার্চ থেকে ২৯শে এপ্রিল মোট ৮ দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন রাজ্যের ব্যাপক সংখ্যক রাজ্যবাসীর কাছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। একই সাথে অপশাসন ও নৈরাজ্যের অবসান ঘটানোর সংগ্রাম। বিগত প্রায় দশ বছর ধরে এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস দল ও সরকার নজিরবিহীন স্বৈরাচারী সন্ত্রাস কায়েম করেছে। স্বৈরাচারী কায়দায় রাজ্যে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। একদিকে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট রাজ থাবা গেড়ে রয়েছে, অপরদিকে শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মহিলাদের ওপর নেমে এসেছে ঘৃণ্য আক্রমণ। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী অংশের মানুষও একইভাবে আক্রান্ত। এমন সর্বনাশা তৃণমূলী শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জনগণকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।
- কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আর এস এস-বিজেপি সরকারের কৃষি আইন, প্রচলিত শ্রম আইন সংস্কার সবই কর্পোরেট স্বার্থে। এই সরকার নয়া উদারনীতি কার্যকর করতে অত্যন্ত তৎপর। শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। এই সময়কালে ২ লক্ষের ওপর কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। সমগ্র দেশে ভয়াবহ কর্মহীনতা। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা শোচনীয়। দারিদ্র্য বাড়ছে। বড় বড় পুঁজিপতির সম্পদ অকল্পনীয় হারে বাড়ছে। করোনা মহামারীর সময়কালে দেশে প্রায় ১৫ কোটি মানুষের কাজ চলে গেছে। দারিদ্র্য, অভাব, বৈষম্য, বুভুক্ষা সমস্ত কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এই করোনা সময়কালে দেশের বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠীর সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৩ লক্ষ কোটি টাকা। গ্যাস, কেরোসিন, পেট্রোল-ডিজেলসহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে ঘটছে। বৈষম্য সমগ্র দেশজুড়ে ক্রমবর্ধমান। সরকারী ভরতুকিতে পুষ্ট হচ্ছে কর্পোরেট শক্তি। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বিলগ্নীকরণ ও বেসরকারিকরণ ঘটাচ্ছে। কর্পোরেটের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ব্যাপক ঋণ মকুব ও বকেয়া ঋণের বিশাল পরিমাণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি দুর্বল হয়েছে। মার্জার (একীকরণ)-এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কলকাতায় হেড অফিস ছিল এমন দুইটি ব্যাঙ্ক মার্জারের ফলে উঠে গেছে। শ্রমিক-কৃষক সহ সর্ব অংশের মানুষ আক্রান্ত। আক্রান্ত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার। জাতীয় শিক্ষানীতির নামে শিক্ষার অধিকারের ওপর নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর আক্রমণ। বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা ও বিরোধিতাকে দেশদ্রোহিতার সমতুল করে দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধিজীবীসহ বহু মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সিবিআই, ইডি, পুলিশ এবং ইউএপিএ ও এনআইএসহ দানবীয় সমস্ত আইন ব্যবহার করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। কর্পোরেট স্বার্থকেন্দ্রিক ভয়ঙ্কর কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধী আন্দোলন দমন করতে প্রশাসন-পুলিশ ও দুষ্কৃতীদের আক্রমণ চালানো হয়েছে।
- দেশের সংবিধানের মর্মবস্তু আজ আক্রান্ত। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে বিজেপি সরকার। সিএএ, এনআরসি'র মাধ্যমে নাগরিকত্ব নির্ধারণে ধর্মকে মাপকাঠি করা হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারগুলি ক্রমান্বয়ে খর্বিত। ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষ প্রসারিত। শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাসসহ সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি উৎসাহিত হচ্ছে। ভারতের মর্মবস্তুকে পালটে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দলিত, আদিবাসী ও অন্যান্য পশ্চাদপদ অংশও হেনস্তা ও আক্রমণের মুখে।
- রাজ্যের তৃণমূল সরকারও নিজেদের সুবিধামত সাম্প্রদায়িক কার্ড ব্যবহার করছে। রাজ্যে তৃণমূল ও বিজেপি'র বোঝাপড়ার রাজনীতি চলছে। এদের মাধ্যমে কর্পোরেটেরা দ্বিদলীয় রাজনীতিকে এরাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
- পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বড়ই সঙ্গীন। আয়ের তুলনায় ব্যয় লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশাল পরিমাণ ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছে রাজ্য। কৃষিতে গুরুতর সঙ্কট। ২০১৪ ও ২০১৭ সালে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার কৃষকসহ সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী আইন রাজ্যে চালু করেছে। কৃষকের আত্মহত্যা এই রাজ্যেও ঘটছে। নতুন শিল্প ও শিল্প বিনিয়োগ রাজ্যে বৃদ্ধি পায়নি বলা চলে। কর্মসংস্থানের অবস্থা বড়ই করুণ। সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ হচ্ছে না। সরকারি চাকরির পরীক্ষাতেও দুর্নীতি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বেহাল চিত্র। শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য। স্কুলছুট বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসনের স্থবিরতা বিস্ময়কর। মস্তানি-তোলাবাজি ও বেপরোয়া দুর্নীতি বর্তমান রাজ্য সরকারের ভূষণ। আইন-শৃঙ্খলার চিত্র মোটেই ভাল না। নারী নিরাপত্তা ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত। গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের উপর পুলিশের বর্বর আক্রমণ ঘটে চলেছে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর পুলিশের নির্মম আক্রমণের পরিণতিতে মইদুল ইসলাম মিদ্যাকে শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।
- এহেন পরিস্থিতির অবসান ঘটনোর লক্ষ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয় ঘটানোর সাথে সাথে বিজেপি'কে রুখে দিতে হবে। বাম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির বিকল্পকে জয়ী করতে হবে। বাম ও সহযোগী, কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংযুক্ত মোর্চাকে জয়যুক্ত করুন। সাধারণ মানুষের নিজেদের সরকার, সংযুক্ত মোর্চার সরকার গড়ে তুলতে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করব। পশ্চিমবঙ্গ ও সমগ্র দেশের স্বার্থে এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসুন।

সংযুক্ত মোর্চার বিকল্প কর্মসূচি

১। গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সমস্ত বিরোধীদের মত প্রকাশের অধিকার সুরক্ষিত করা হবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের দ্রুত মুক্তি দেওয়া হবে। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কঠোরভাবে অনুসৃত হবে। প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা নয়। শান্তি, সম্প্রীতি ও স্থায়িত্ব চাই।

২. এক বছরের মধ্যে সরকারি-আধা সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ। সমস্ত নিয়োগ হবে নিয়মানুযায়ী, মেধার ভিত্তিতে।

৩. বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করার ওপর জোর দেওয়া হবে। স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প পুনরায় শক্তিশালী করা হবে।

৪. কর্মসংস্থানের মূল তিনটি ক্ষেত্র—কৃষি, শিল্প ও পরিষেবায় কাজের সুযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি।

৫. অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর ও মাঝারি শিল্পের পুনরুজ্জীবন। সহজ ঋণের ব্যবস্থা করা।

৬. চাষের খরচ কমিয়ে, কৃষকের কাছে উৎপাদিত ফসলের দাম বাড়ানো। চাষকে লাভজনক করতে সরকারের তরফে মিনিকিট, সার, ক্ষুদ্র সেচ ও সেচের জলের প্রসার। কৃষিপণ্যের কেনাবেচার জন্য সমবায় সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবন। কৃষকের জন্য কেবল এককালীন ঋণ মকুব নয়, ফসলের দেড়গুণ দামের নিশ্চয়তা, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকের কাছ থেকে সরকারের প্রয়োজন মতো ফসল ক্রয় করা হবে।

৭. রাজ্যের এপিএমসি অ্যাক্ট বাতিল। কারণ সেগুলিও কৃষককে কেন্দ্রের কৃষি আইনের মতো একইরকম বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কেন্দ্রের তিনটি কৃষি আইন রাজ্যে কার্যকর হবে না।

৮. ভূমিসংস্কারে জমি পাওয়া গরীব কৃষক যাঁরা উচ্ছেদ হয়েছেন, তাঁদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

৯. রেগা—একশো দিন না। ১৫০ দিন। একে শহরাঞ্চলেও প্রসারিত করা হবে।

১০. ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামীণ জনগণ বিশেষত গরিবদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

১১. শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি মাসে ২১,০০০ টাকা। প্রবাসী বা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য আলাদা দপ্তর। বিশেষ সুরক্ষা প্রকল্প। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মাসে ২,৫০০ টাকা ভাতা ও সস্তায় রেশন-বন্ধ চটকল, চাবাগান ও অন্যান্য বন্ধ শিল্পের শ্রমিকদের জন্যও এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সমস্ত ধরনের অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করা হবে। সরকারি প্রকল্পে কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিকদের নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে। আই সি ডি এস, আশা, মিড-ডে মিল সহ প্রকল্প কর্মীদের সম্মানজনক ভাতা প্রদান ও কাজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে। সরকারী কর্মচারী ও পেনশনার্সদের ন্যায্য দাবির বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া হবে।

১২. খাদ্য সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব ও সর্বজনীন রেশন—গরিবদের জন্য ২ টাকা কেজি চাল বা আটা প্রতি মাসে ৩৫ কেজি করে প্রতি পরিবারে সরবরাহ— নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজারের তুলনায় কম দামে সরবরাহ— সকলের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।

১৩. ছোট ও মাঝারি শিল্পের ওপর গুরুত্ব—বৃহৎ শিল্প গড়ার উদ্যোগ—তথ্য, জৈবপ্রযুক্তি এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের সম্ভাবনাগুলির সদ্ব্যবহার- কৃষিভিত্তিক শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পসহ ইস্পাত, অটোমোবাইল, পেট্রোকেম, বিদ্যুৎ, সিমেন্ট, চামড়া, বস্ত্রশিল্প স্থাপনের উদ্যোগ।

১৪. পরিবেশ সংরক্ষণ ও তার বিকাশের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। সব ধরনের দূষণ নিয়ন্ত্রণে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জনগণকে যুক্ত করে পরিবেশ রক্ষায় শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

১৫. সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সবই বিনামূল্যে। জনস্বাস্থ্যে সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। মহামারী ও রোগ প্রতিরোধে অগ্রাধিকার। ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা।

১৬. বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি—গরিব অংশের মানুষের জন্য বিদ্যুতের দামে ভরতুকি। ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে সরকারি ভরতুকি।

১৭. শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেটের অন্তত ২০ শতাংশ বরাদ্দ—নিরক্ষরতা নির্মূল করা—শিক্ষায়তনে গণতন্ত্র— শিক্ষায় বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ বন্ধ করা—ভর্তির পদ্ধতি স্বচ্ছ করা — শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ — স্বচ্ছতা বজায় রেখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে শূন্যপদ পূরণ (প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি, এস এল টি এমটি, ওয়ার্ক এডুকেশন, ফিজিক্যাল এডুকেশন সহ) — মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো সুসংহত, উন্নত ও প্রসারিত করা— বৃত্তিমূলক, কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষার ওপর জোর, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গবেষণার উপর গুরুত্ব— সমস্ত অস্থায়ী শিক্ষকদের প্রতি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি— ছাত্র সংসদগুলির নিয়মিতভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত পরিচালন ব্যবস্থা।

১৮. সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে সার্বিকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনাকে উৎসাহিত করা হবে।

১৯. ক্রীড়ার প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া। ক্রীড়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্যচর্চার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।

২০. সমকাজে সমমজুরি। নারী নির্যাতন, গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে শহরে ওয়ার্ড বা বরোতে এবং গ্রাম বাংলায় ব্লক স্তরে বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তৃতীয় লিঙ্গ ও অন্যান্য প্রান্তিক যৌন এবং লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের (LGBTQIA +) জন্য প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হবে।

২১. তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ অংশের জন্য সংরক্ষণের রোস্টার বাস্তবায়িত হবে।

২২. শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের স্বার্থে আরপিডি অ্যাক্ট-১৬ ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন-১৭ কার্যকর করা হবে। প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষদের শিক্ষার আওতায় আনা হবে, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সকলকে এক বছরের মধ্যে শংসাপত্র দেওয়া হবে। মাসিক ভাতা এক হাজার টাকার পরিবর্তে মাসে দু'হাজার টাকা দেওয়া হবে।

২৩. সম্পদের বন্টনের জন্য যে স্টেট ফিনান্স কমিশন ছিল, তার পুনরুজ্জীবন। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে নিজস্ব ব্যাঙ্ক। সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ। রাজ্য সরকার পরিচালিত রুগ্ন সংস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ।

২৪. সমবায়ের প্রসার। সমবায়ের পণ্য বিক্রিতে অন-লাইন বিপণন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহিত করা হবে।

২৫. পরিকল্পনা পর্ষদকে আরো কার্যকর করা—বাংলা ভাষাকে প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে উৎসাহিত করার পাশাপাশি হিন্দি, নেপালি, উর্দু, সাঁওতালি ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা, রাজবংশী-কুরুক- কুরমিসহ পশ্চাদপদ অংশের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল, সুন্দরবন ও রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষ করে গুরুত্ব পাবে। দার্জিলিং পাহাড়ী এলাকায় সর্বোচ্চ স্বশাসন সুনিশ্চিত হবে। রাজ্যের বস্তিগুলির উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে।

২৬. বেআইনি চিটফান্ডগুলির দাপট রোখা—চিটফান্ডের কর্মকর্তা ও তাদের সহযোগীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করা—জনগণের গচ্ছিত টাকা ফেরত দেওয়া।

২৭। কেন্দ্রের সরকারের জনবিরোধী নীতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি থাকবে— রাজ্যগুলির সাংবিধানিক অধিকার হরণের প্রতিবাদে রাজ্য সরকার সতর্ক থাকবে— সিএএ, এনআরসি ও এন পিআর'এর মতো বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব ধারণা রাজ্যে কার্যকর করা হবে না— কেন্দ্রের সংগৃহীত মোট রাজস্বের ৫০ শতাংশ রাজ্যকে দিতে হবে, জিএসটি বাবদ রাজ্যের প্রাপ্য অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে মিটিয়ে দিতে হবে। —নদীভাঙন, বন্দরের নাব্যতা রক্ষায়, দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় পুঁজি বিনিয়োগে কেন্দ্রের ভরতুকির জন্য প্রয়াস— উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে কেন্দ্রের কাছে সাহায্যের দাবি উত্থাপন করা হবে।

আমাদের আবেদন

বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস যে ব্যক্তি কুৎসা, ব্যক্তি আক্রমণ এবং ধর্মান্ধতার নজির বাংলার মাটিতে আনতে চাইছে তারই বিরুদ্ধে আমাদের সংযুক্ত মোর্চার লড়াই জারি রয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার মাধ্যমে বাংলাকে গড়ে তুলতে চাই আমরা।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা, দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ সরকার গড়তে সংযুক্ত মোর্চাকে জয়ী করুন। রাজ্যের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে কর্মসংস্থানের দরজা খুলে দিতে সংযুক্ত মোর্চাকে সমর্থন করুন। বাংলার ঐতিহ্য রক্ষায় সংযুক্ত মোর্চার সরকার গড়ে তুলুন।

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী ও আজকের প্রেক্ষিত

গৌতম রায়

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্তিম পর্বে মিত্রশক্তির কাছে পাক হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সন্তানদের সংগঠন 'প্রজন্ম ৭১' দীর্ঘদিন ধরে যে প্রশ্নটিকে সামনে মেলে ধরেছে 'তোমাদের যা বলার ছিলো, বলছে কি তা বাংলাদেশ'—এই প্রশ্নটিই যেন আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি সমাজ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক লড়াই লড়েছিল, সেই লড়াইয়ের মূল ভিত্তি হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি'র সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। গত ১০০ বছরে বিশ্বের রাজনৈতিক আন্দোলন বিশ্লেষণের প্রেক্ষিত প্রথম তিনটি আন্দোলন, যা কোন অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পরিপূর্ণ ছিল না, এমন একটি তালিকা তৈরি করলে, প্রথমেই থাকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের নাম।

মুক্তিযুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মনোভাব ভাঙতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় পাক হানাদাররা বহু চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা কোন অবস্থাতেই সফল হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ শেষ দিন পর্যন্ত কোনরকম প্ররোচনায় ফাঁদে পা না দিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটিকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেছে। তাই মহান মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের প্রেক্ষিতে, বিজয় দিবস এবার কেবল বাংলাদেশেই নয়, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ, তথা দক্ষিণ এশিয়ার মানুষদের কাছে নিজেকে মেলে ধরেছে একটা ভিন্ন মাত্রা নিয়ে। গোটা বিশ্বই যখন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে আকীর্ণ, গণতন্ত্রের সংকটে দীর্ণ এবং সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের আঘাতে ছিন্নভিন্ন, এইরকম একটি সময়ে, সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে, মহান মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র লড়াই, নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক প্রেরণা উপস্থাপিত করে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে, বহু সহস্র নারীর লাঞ্ছনার বিনিময়ে, বহু আত্মত্যাগ, রক্ত স্বেদ, কান্নার বিনিময়ে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টি। 'মুসলিম জাতীয়তা'র উপর ভিত্তি করে দেশভাগের অল্প কিছুদিনের মাথাতেই, মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি সশস্ত্র সংগ্রামের ভেতর দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান গ্রহণ করেছিল। তা ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

সেই ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে বাংলাদেশ রক্ষা করতে পারেনি। রক্ষা করতে না পারার একটি বড় কারণ হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা। এই কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডের পর, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ, কার্যত পাকিস্তানের একটি ছায়া উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর সরকার যুদ্ধাপরাধের নিরিখে। সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বরনের অব্যবহিত পরে রাজাকার পুনর্বাসনকারী জিয়াউর রহমান দেশের বাইরে গা ঢাকা দিয়ে থাকা, কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে দেশে ফিরে আসার অনুমতি দেয়। জিয়া পত্নী খালেদা জিয়ার প্রধানমন্ত্রীত্ব কালে, বিচার ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে, বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মৌলবাদী শক্তি, আদালতকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেই, কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বরণ থেকে শুরু করে ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করবার সময় পর্যন্ত গোটা বাংলাদেশে, সেখানকার রাষ্ট্রশক্তি, ধর্মনিরপেক্ষতা আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়টিকে কার্যত একটি নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত করেছিল। অবিভক্ত পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা নিজেদের অকমর্ণ্যতা ঢাকতে যেভাবে ইসলামীকরণকে একমাত্র ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল সেই পথেই, বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর, অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখলকারী জিয়াউর রহমান, এইচ এম এরশাদ ব্যবহার করতে শুরু করে। আজ বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তীতে আমাদের সব থেকে বেশি যন্ত্রণাবিদ্ধ অভিজ্ঞতা হল; একাত্তরের ঘাতক-দালাল যুদ্ধাপরাধীদের জিয়াউর রহমান, এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার শাসনকালে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পুনর্বাসনের বিষয়টি। রাজাকার পুনর্বাসনের ভেতর দিয়ে এই সব ব্যক্তিরা, মহান মুক্তিযুদ্ধের যে মূল চেতনা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, সেইসাথে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যেকটি চেতনাকেই ক্ষতবিক্ষত করতে শুরু করে। গণতন্ত্র অবলুপ্ত হয় বাংলাদেশ থেকে। ধর্মনিরপেক্ষতা তো হয়ই। আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটি শব্দও উচ্চারিত হয় না বাংলাদেশের প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

এই অবস্থায় সব থেকে স্মরণীয় হলো সেদেশের মুক্তবুদ্ধির বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা। লেখক-শিল্পীদের ভূমিকা। আবুল ফজলের মতো বুদ্ধিজীবী যিনি গত শতকের চারের দশকে বাংলার দ্বিতীয় জাগরণ নামে অভিহিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও 'শিখা' গোষ্ঠীর সক্রিয় একজন সভ্য ছিলেন, তিনিও ধীরে ধীরে মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে শুরু করলেন। জিয়াউর রহমানের কাছে মুক্তবুদ্ধির মানুষজনরা হয়ে উঠলেন সব থেকে বড় শত্রু।

আজ ভারতে যেভাবে এখানকার রাষ্ট্রশক্তি, মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক, ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী সমাজকে সব থেকে বড় শত্রু বলে মনে করে, তেমনটাই সেদিন বাংলাদেশের শাসকেরাও মনে করেছিল। তাই আজকের ভারতে যেমন অন্নদাশঙ্কর রায় জীবিত থাকলে, তাঁকে হত্যা করতে পিছপা হতো না রাজনৈতিক হিন্দু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শিবির। কারণ, কালবুর্গি থেকে গোবিন্দ পানসারে, গৌরী লঙ্কেশ, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভারতের সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক শক্তি, অর্থাৎ, হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা, হত্যা, ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করেছে। উপমহাদেশে ফ্যাসিবাদের চরণধ্বনি হিসেবে সাম্প্রতিক অতীতে সেই পথ নির্মাণের প্রথম প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায় বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর। মুক্ত বুদ্ধির চিন্তাচেতনার বিরোধী রাষ্ট্রনায়ক জিয়াউর রহমান, এইচ এম এরশাদ, খালেদা জিয়ার ভেতরে পাক হানাদারদের বুদ্ধিজীবি হত্যার আদলেই মানসিকতা কাজ করতো।

যুদ্ধপরাধীদের সামাজিক পুনর্বাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গজননী সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান, কলিম শরাফী, কবীর চৌধুরী, বদরুদ্দীন উমর, আহমেদ শরীফ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, সানজিদা খাতুন, সুলতানা কামাল, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, অনুপম সেন, দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, সৈয়দ হাসান ইমান প্রমুখের যে লড়াই, সেই লড়াই ছিল কিন্তু জিয়াউর রহমান থেকে, খালেদা জিয়া, এইসব শাসকদের কাছে সব থেকে।

ছয়ের দশকে আইয়ুব খান যেভাবে বাঙালিকে বিভক্ত করে, তার ফৌজি শাসনকে চিরস্থায়ী করতে সচেষ্ট ছিলেন, ঠিক সেই পথেই বাঙালিকে বিভক্ত করে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজন তৈরী করে, পাকিস্তান যাতে আবার বাংলাদেশকে নিজেদের করায়ত্ত করে নিতে পারে সব রকম ভাবে, তার জন্য সচেষ্ট ছিলেন জিয়াউর রহমান, এরশাদ, খালেদা জিয়া। মূল উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের যে তাদের মূল মস্তিষ্ক, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তাকে সব রকম ভাবে সাহায্য করা। বাংলাদেশের যুব সমাজ যেন কোনো অবস্থাতেই রাজনীতিমুখী না হয়, শাসকের অপকৌশল সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তার জন্য বাংলাদেশে একটা সমান্তরাল অর্থনীতি এইসব শাসকেরা চালিয়েছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মদতপুষ্ট বিভিন্ন ধরনের সেবা নিয়ে বসে থাকা এনজিওদের মাধ্যমে।

কার্যত এইসব এনজিওরা বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বরণের সময় কাল থেকে শেখ হাসিনার প্রথম দফার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত, গোটা বাংলাদেশে একটা সমান্তরাল প্রশাসন চালিয়ে গেছে। সে দেশের শাসকদের প্রত্যক্ষ মদতে শাসকদের স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে। বলাবাহুল্য, শাসকের স্বার্থ পূরণের এইসব উদ্দেশ্যের পেছনে কিন্তু লুকিয়ে ছিল তাদের মূল মস্তিষ্ক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন জাজ্জ্বল্যমান ছিল, তখন গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের শাসন কায়েম করবার সবথেকে বড় তাগিদেই, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, পাকিস্তানের মতো তাঁবেদারকে ব্যবহার করে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা পাকিস্তান ক্রীড়নক, পাকবাহিনীর সেবাদাস হিসেবে আত্মনিবেদিত ছিল, তাদের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করে, বাংলাদেশের মাধ্যমে, গোটা দক্ষিণ এশিয়াতে, নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের প্রাথমিক পদক্ষেপ অত্যন্ত জোরদারভাবে শুরু করেছিল।

এরশাদের আমল পর্যন্ত এই পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত তীব্র। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়ার সময় কালের প্রায় সমান্তরাল সময়ে স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী গণ আন্দোলনের জেরে, এরশাদের ক্ষমতা ত্যাগ, এই ঘটনাকে নিছক কাকতালীয় বলে, আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। কারণ, স্বৈরাচারী এরশাদের পরিবর্তে তখন খালেদা জিয়ার মতো একটি পুতুলকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়ে, তাকে নিয়ন্ত্রণের মূল সুতোটি ইসলামাবাদের হাতে রাখার যে পথ, সেই পথেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হেঁটেছিল।

কারণ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের জেরে এরশাদের পর যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে, সেই সরকার কি খালেদা জিয়াকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে কোন রকম সাহায্য করেছে?

এই প্রশ্নটিই এই কারণে তীব্র হয়ে ওঠে যে, শেখ হাসিনার প্রথম দফার প্রধানমন্ত্রীত্বের অবসানে, জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ঠিক মুখে এই শাহাবুদ্দিন আহমেদ তৎকালীন নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে প্রবল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে, শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করে, নির্বাচনকে কার্যত প্রহসনে পরিণত করে। এই কাজে অবশ্যই ভারতের তৎকালীন বিজেপি সরকার, বাংলাদেশের সমস্ত রকমের সংখ্যালঘু মৌলবাদী এবং পাকিস্তানপন্থী শক্তিকে সাহায্য করেছিল। হিন্দু মৌলবাদ এবং মুসলিম মৌলবাদ উভয়েই, শ্রেণিস্বার্থের তাগিদে নিজেদের অভিজ্ঞতা হেতু যে যখন বিপদে পড়েছে, অপর সাম্প্রাদায়িক ও মৌলবাদ সেই বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে সব রকম ভাবে আত্মনিয়োগ করেছে।

এটা কেবল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বা ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গোটা বিশ্বের ক্ষেত্রে উভয়ের মৌলবাদের মধ্যে এই শ্রেণিস্বার্থ জনিত সখ্যতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া আছে। ইউরোপে খ্রিস্টান মৌলবাদ আর মুসলিম মৌলবাদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহযোগিতার লক্ষণ খুব তীব্রভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তাই বাংলাদেশে মুসলিম মৌলবাদকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে, ভারতের হিন্দু মৌলবাদী শক্তি নিজেদের লাভের অঙ্ক বুঝে নিতে চাইছিল। কারণ, বাংলাদেশে সেখানকার সংখ্যাগুরু মৌলবাদের দাপটে যদি সে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা নির্যাতিত হয়, তাহলে ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু মৌলবাদীরা, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টির অবতারণা করে, ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার চালাতে পারবে।

এই পাটিগণিতকে অবলম্বন করেই ২০০১ সালের বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ত্রিপাক্ষিক ষড়যন্ত্রে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সপরিবারে শহীদ হওয়ার পর থেকেই, বাংলাদেশে যে গণতন্ত্রের সংকটই আবির্ভূত হয়, সেই সংকট গোটা দেশটিকেই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে মুছে ফেলে, পাকিস্তানি ঔপনিবেশিকতার যে ছায়া, তাকে তীব্র করে তুলতে শুরু করে।

এই পর্যায়ে রাজাকার-আলবদর-আলশামস সহ গোটা যুদ্ধাপরাধীদের যে ভূমিকা তৎকালীন শাসকদের প্রত্যক্ষ মদতে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের উপর প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করে, তাকে কিন্তু বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ এক কথায় মেনে নেয়নি। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশে, সামাজিক আন্দোলনকে একটা উচ্চমাত্রায় উপনীত করে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ, ধীরে ধীরে রাজাকার-আলবদর-আলশামস সহ যাবতীয় যুদ্ধাপরাধী এবং ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে শুরু করেন। শাসকেরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধকে কার্যত অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদানকে ঢেকে দিয়ে জিয়াউর হমানকে 'স্বাধীনতার ঘোষক' (!) হিসেবে উপস্থাপিত করে একটা বিকৃত চেতনা বাংলাদেশের মানুষদের মধ্যে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায় জিয়াউর রহমানরা।

স্বৈরাচারী এরশাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন, সেই আন্দোলন সংগঠিত করবার ক্ষেত্রেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সেই

এরপর ৭-এর পাতায়

বেতারে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে আর এস পি'র পার্থসারথি দাশগুপ্ত-র বক্তব্য

এরাজ্যে এমনই এক সময়ে দেশের পাঁচটি রাজ্যের সঙ্গে এখানেও বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে, যখন পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশ এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখোমুখি। ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে করোনা মহামারি সারা দেশের অর্থনীতি ও সমাজকে গভীর সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছে একথা সত্য, কিন্তু বাস্তবে কেন্দ্রে এন ডি এ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই সরকারের কর্পোরেট ঘেঁষা আর্থিক নীতিসমূহ দেশের আর্থব্যবস্থাকে কর্পোরেটনির্ভর সর্বগ্রাসী নয়াউদারবাদের কাছে সমর্পণ করেছে। এই নয়াউদারবাদ আমাদের দেশের একাংশ সম্পন্ন হিন্দুদের মধ্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে। ছদ্মজাতীয়তাবাদ বহুক্ষেত্রে কিছু মানুষের সমর্থন আদায় করেছে। না হলে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে এত বেপরোয়াভাবে এক দেশ, এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক ধর্ম ইত্যাদি নির্ভর উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারত না। সংবিধানের বহুত্ববাদী কাঠামোটাকে এভাবে ভেঙে ফেলতে একের পর এক কর্মসূচি, এবং প্রতারণামূলক ডবল-ইঞ্জিনের শ্লোগান উচ্চকিত করতে দ্বিধা করত।

হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে দেশি বিদেশি কর্পোরেটদের স্বার্থে এভাবে দেশের ১৩০ কোটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার জলাঞ্জলি দেওয়ার ঘটনা পূর্বের কেন্দ্রীয় সরকারগুলির সমস্ত ঐতিহ্যকে ধ্বস্ত করেছে। বিজেপি সরকারের হাতে পরিকল্পনা কমিশন ধ্বংস হয়েছে। তার বিকল্পে পুরোপুরি কর্পোরেটসেবী নীতিআয়োগ চালু হয়েছে। দেশের সমস্ত রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্র সহ ব্যাঙ্ক বীমা সংস্থাকে বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। এমনকি যে বিশ্বব্যাঙ্ক আই এম এফ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী দিগ্‌দর্শন মোদীর কাছে বেদমন্ত্র, তারাও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে করোনাজনিত সংকট থেকে সাময়িক আরোগ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রগুলিকে সযত্নে রক্ষা করা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার কয়েকটি জরুরী ক্ষেত্রকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনার পথ দেখানো সত্ত্বেও করোনাকালে মোদী সরকার সম্পূর্ণ উল্টোপথে হেঁটেছেন।

গত বছরের আচমকা প্রধানমন্ত্রীর একতরফা লকডাউন ঘোষণা যেভাবে অর্থনীতির সর্বনাশই নয়, কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষকে চারঘণ্টার মধ্যে আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন, বিপর্যস্ত জীবনজীবিকায় অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দিয়ে ঘণ্টা বাজানো এবং প্রদীপ জ্বালানোর নাটক সংঘটিত করেছে, কোনো সভ্য দেশের রাষ্ট্রশাসকের পক্ষে তা অমানবিক বোধবুদ্ধিশূন্য নৃশংসতা ছাড়া আর কিছু নয়। সেই সময়েই সংসদের তোয়াক্কা না করে নয়া শিক্ষানীতি, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ইউনিফর্ম লেবার কোড, তিনটি কৃষকস্বার্থবিরোধী কৃষি বিল পাশ করিয়েছে। গত বছর এভাবেই অসংখ্য আইনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চার হাজার প্রশাসনিক আদেশের খড়্গ চালিয়ে নাগরিকদের অধিকার লুণ্ঠন করেছে।

এরাজ্যের নির্বাচনে কর্পোরেট অর্থে এবং স্বার্থে বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতা নয়, দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তা নির্ভর রাজনীতির পথে প্রতিশ্রুতির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। রাজ্যে মমতা ব্যানার্জী প্রমুখর নেতৃত্বে গত দশ বছর ধরে লুটেরাদের স্বর্গরাজ্য নির্মিত হয়েছে, জাতীয় স্তরে বিজেপিও একচেটিয়া কর্পোরেট ও লগ্নী পুঁজিপতিদের চক্রে সারা ভারতব্যাপী দুর্বৃত্ত সমাজের কেন্দ্রীয় আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেরই সহায়তায় রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচিত সরকারগুলির পতন ঘটাচ্ছে বিজেপি কর্পোরেট অর্থের স্রোতে। সারা দেশের নীতিনৈতিকতাহীন রাজনীতিবিদদের মতো পশ্চিমবঙ্গেও এই সব দুর্বৃত্তের দঙ্গল তৃণমূল দল ছেড়ে বিজেপি'র শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছে কোন যুক্তিতে? মানুষকে তার অপমান, আত্মহত্যা, অবসাদ, বেকারত্ব, শত শত প্রবাসী শ্রমিকদের পথ দুর্ঘটনায় অনাহারে মৃত্যু সব ভুলিয়ে দিতে বিজেপি'র সোনার বাংলার স্বপ্ন আর তৃণমূলের 'সব ভোট মমতার শ্লোগান' পল্লবিত হচ্ছে।

এমনই ভণ্ড তৃণমূল কংগ্রেস দল যে ২০১২ সালের ভূমি সংস্কার সংশোধনী আইন এবং ২০১৪ সালের পশ্চিমবঙ্গ কৃষি পণ্য বিপণন সংশোধনী আইনের মাধ্যমে বেসরকারি ক্ষেত্রের হাতে কৃষি জমি দখল ও চরিত্র বদল, মান্ডির বাজারের বাইরে কৃষি পণ্য বিপণন মজুত এবং সংগ্রহ সহ চুক্তি চাষের অধিকার ছেড়ে দিয়ে রাজ্যের কৃষকদের সর্বনাশ করেও দিল্লীর কৃষকদের সমর্থনে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করছে। এই হট্টগোলের মধ্যে সেই সব বিষয় হারিয়ে যাচ্ছে। কে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত, কার কর্মীরা ধর্ষণ ও কয়লা-গোরু পাচারে বেশি অভিযুক্ত, কে বেশি হিন্দু বা কে বেশি মুসলমান, সেই সব অরাজনৈতিক বিষয় বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বৈদ্যুতিন এবং ছাপানো খবরের কাগজের কর্পোরেট মালিকদের আর্থিক বদান্যতা অনবরত বর্ষিত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস নয়, বিজেপির নির্বাচনী প্রচারে। প্রচার মাধ্যমে দুটি দলের মধ্যে ছায়াযুদ্ধের নাটকে একটিকে অপরটির বিকল্প রূপে দাঁড় করানো এবং সংযুক্ত মোর্চাকে গুরুত্বহীন করার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। ধনিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষার দিক থেকে একই অবস্থানের দুটি দলের আপাত ভিন্নমুখী ন্যায্যতা নির্মিত হচ্ছে। একজন 'বাংলার মেয়ে', অপরজন হিন্দুসমাজের 'নিরাপত্তার কাণ্ডারী'। বেকারত্ব, পেট্রল ডিজেল গ্যাসসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, শিল্পে অবোন্নয়ন, বঞ্চনা, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও কর্পোরেট আধিপত্য, নারী নির্যাতন, আমফানের টাকা লুঠ, সরকারি প্রশ্রয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের টাকা লুঠ ও জি এস টি নোটবন্দীর শানিত আঘাতে অসংগঠিত-সংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশাকে অস্পষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এভাবে দুটি দুর্নীতিগ্রস্ত লুম্পেন দঙ্গল প্রভাবিত নেতৃত্বের সমর্থনে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত নির্মিত হচ্ছে।

আমরা সংযুক্ত মোর্চার তরফ থেকে স্পষ্ট ভাষায় আমাদের ইস্তাহারে এবং দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য সহ দেশের দুরবস্থার প্রেক্ষিতে বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে, এই দুটি দলের অপশাসন থেকে রাজ্যবাসীকে মুক্ত হবার আহ্বান জানাচ্ছি। দুটি দলের মধ্যে কে বেশি বিপজ্জনক, সে বাছাবাছির অর্থ একটিকে অনুগ্রহ করে গণতন্ত্রধ্বংসকারী মূল কর্পোরেট ফ্যাসিবাদী শক্তিকে আবাহন করে নেওয়া। এই ঐতিহাসিক ভ্রান্তির আবহনির্মাণে উঠেপড়ে লেগেছেন একদল মেকী বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও দল। জনপ্রিয়তার রাজনীতির নামে তাঁরা সংযুক্ত মোর্চার বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তিরই হাত শক্ত করছেন। সংযুক্ত মোর্চার নেতৃত্বে বামগণতান্ত্রিক শক্তি একমাত্র পারে এই জাতীয় বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষা করতে। বিজেপি সরকার সাড়ে তিনমাসব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী গণপ্রতিরোধকে দেশদ্রোহী সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করে অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাচ্ছে, বামগণতান্ত্রিক শক্তিই পারে সেই অপশক্তির মোকাবিলা করে নির্বাচনী সংগ্রামকে রাজনৈতিক তথা শ্রেণি সংগ্রামে সংহত করতে। তাই রাজ্যবাসীর কাছে আমাদের আহ্বান, বামফ্রন্টের পাশে কংগ্রেস এবং আই এস এফের সংযুক্ত মোর্চার উপর সম্প্রদায়নির্ভর রাজনীতির কালি ছেটানো হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি'র যৌথ প্রয়াসে, সেই প্রচেষ্টার সমুচিত জবাব দিতে হবে। আপনাদের কাছে আবেদন, এই দুটি দলকে সমুচিত জবাব দিতে পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্ত মোর্চার সরকার গঠন করুন। নিম্নবর্গের কৃষি মজুর, জেলায় জেলায় পরিযায়ী প্রবাসী শ্রমিক, হত দরিদ্র সংখ্যালঘু দলিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকারের স্বতন্ত্র অভিমুখ আজ মিলেছে বামশক্তির অক্ষ ঘিরে। রাজ্য ও দেশের মানুষের সর্বনাশকারী তৃণমূল এবং বিজেপিকে পরাস্ত করে এই বিপর্যয় কালে সাধারণ মানুষের মঞ্চ সংযুক্ত মোর্চাকে জয়ী করুন।

পশ্চিমবঙ্গে ডবল ইঞ্জিনের সরকার গঠনের ভয়াবহ আবেদন!

১-এর পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গে এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট তৃণমূল সরকারের অত্যাচারেই রাজ্যবাসীর প্রাণ অতিষ্ঠ। ডবল ইঞ্জিন হলে যে কী ভয়াবহ পরিণতি হবে তা অকল্পনীয়।

মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা ভোটে জাতীয় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল। সবাই জানেন যে, এই রাজ্যটিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অজস্র কুকীর্তি এবং তৎকালীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহানের লক্ষ কোটি টাকার 'ব্যাপম' কেলেঙ্কারিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগে সাধারণ মানুষ বিজেপিকে পরাস্ত করেছিল। অসাধারণ গণতন্ত্র প্রেম বিজেপি'র! প্রথম থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। জনগণের রায় উল্টে দিয়ে নির্বাচিত কংগ্রেস দলের কয়েকজনের নীতি আদর্শহীনতা বা মেরুদণ্ডহীনতার সুযোগে বহু সহস্র কোটি টাকার বিনিময়ে এম এল এ কেনার প্রক্রিয়া চলে।

দেশ যখন করোনা অতিমারি আতঙ্কে ত্রাহি ত্রাহি সেই সময় গরু ছাগলের মতো কিনে নেওয়া বিধায়কদের কর্নাটক রাজ্যে 'চাটার্ড প্লেন'এ করে পাচার করা হয়। এইসব নীতি বর্জিত এম এল এদের দৌলতে বা সমর্থনে পুনর্বার শিবরাজ সিং চৌহানের মতো এক নেতাকেই মুখ্যমন্ত্রী করে মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকার গঠিত হয়। নরেন্দ্র মোদীর 'না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা'র চিৎকার যে নেহাতই সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য তা, আরও একবার প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত।

যত দুষ্কৃতীই হোক, বিজেপি দলে যোগ দিলে তারা সবাই সব অন্যায় থেকে মুক্ত। অধুনা পশ্চিমবঙ্গে এমন উদাহরণ অসংখ্য। সিবিআই, ইডির তদন্ত কিভাবে প্রভাবিত হয়ে চলেছে তাও সবাই জানেন। যেসব তৃণমূল নেতাদের ভাগিয়ে দেবার নিদান দিয়েছিলেন বিজেপি'র তৎকালীন সভাপতি ও বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ, তাঁরাই এখন এই রাজ্যে বিজেপি'র সম্পদ। আসন্ন নির্বাচনে তাঁরাই বিজেপি'র মুখ। রাজ্যবাসী ক্ষুব্ধ এবং বিব্রত। এসব কোনদিনই পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি নয়।

এসব কথা থাক। মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে বিজেপি'র ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। অন্যান্য প্রসঙ্গ বাদ দিলেও প্রতিনিয়ত যে বীভৎসার সঙ্গে নারী সমাজ আক্রান্ত তার বিবরণ যে কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে চরম হতাশায় নিমজ্জিত করে।

এইতো মাত্র কিছুদিন আগেই মধ্যপ্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানী গোয়ালিয়রে এক নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল। রাতের অন্ধকারে কয়েকজন দুষ্কৃতী এক ৬২ বছরের বৃদ্ধাকে ছুরি এবং পিস্তল পিঠে ঠেকিয়ে এক টিলার ওপর নিয়ে যায়। ২৫ মার্চের টাইমস অফ ইন্ডিয়া জানাচ্ছে যে, সেই দুর্ভাগা মহিলাকে একাধিক ব্যক্তি ধর্ষণ করে। নির্জন এক পাহাড় চূড়ায় সেই মহিলার চিৎকারে কেউ সাড়া দেবার মতো ছিল না। একাই নরপিশাচদেরকে ক্রমাগত বাধা দেবার চেষ্টা করেন। ফলস্বরূপ এই মানুষটিকে ছুরি দিয়ে বারবার আঘাত করে রক্তাক্ত করে ফেলে। অপরাধীরা ভদ্রমহিলাকে মৃত ভেবে নগ্ন অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। গত ১৭ মার্চ পুলিশ নাকি কয়েকজনকে আটক করেছে। কিন্তু এমন অঘটন তো ডবল ইঞ্জিনের দৌলতে রাজ্য জুড়ে ঘটেই চলেছে। প্রতিকারহীন হিংস্র আক্রমণ নিয়মিত চলছে। অসভ্য বর্বরদের শাসনে ন্যূনতম মানবিক বোধ পর্যন্ত বিলুপ্ত করার ব্যবস্থা সবেগে চলেছে। এর অবসান ঘটাতেই হবে।

দ্বিচারিতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি—

বিজেপি'র সর্বোচ্চ নেতারা অসম নির্বাচনে সোচ্চারে প্রচার করছেন ওই রাজ্যে এন আর সি প্রয়োগ করা হবে না। প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। এদের অনেকেই ডিটেনশন ক্যাম্প বা নরকসম কারাগারে বন্দি। কৌতুককর হলেও সত্য যে, এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ধর্মমতে হিন্দু। তাঁদের মধ্যে যেমন বাংলাভাষী মানুষ রয়েছেন তেমনি, নেপালিভাষী, হিন্দিভাষী, এমনকি অসমীয়া ভাষার বহু মানুষও রয়েছেন। অসম রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপি'র অবস্থা কাহিল। ওই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ এই ফ্যাসিবাদী দলটির বিরুদ্ধে একজোট। বিপদ বুঝে তারা নির্বাচনী সভায় বলে চলেছেন 'নো এন আর সি' মানুষকে প্রতারিত করার অপচেষ্টা চলছে।

সেই একই বিজেপি'র নেতারা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রচারে বলে বেড়াচ্ছেন 'ঘুসপেটিয়া' জনসংখ্যাকে 'বঙ্গাল' থেকে এর আর সি মারফৎ ফেরৎ পাঠানো হবে। অর্থাৎ, এই রাজ্যে বিজেপি 'সোনার বাংলা' গড়তে সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। সীমাহীন দ্বিচারিতার নতুন নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করছে নরেন্দ্র মোদীর দল আর এস এস অনুপ্রাণিত ভারতীয় জনতা পার্টি। পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মানুষ নিশ্চিতই এই বিজেপিকে সমূলে উৎখাত করবে।

মোদী সরকারের ফ্যাসিবাদী আক্রমণ

মনোজ ভট্টাচার্য

মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দুটিই মোদী-শাহ চক্রের শাসনকাল বিপর্যস্ত। ভারতে এমন ভীতিজনক পরিস্থিতি স্বাধীনোত্তর কোনকালেই দেখা যায়নি। রাষ্ট্রীয় সরকারের সঙ্গে দ্বিমত হলে কিংবা সরকারের কোনও সিদ্ধান্তের সমালোচনা করলেই তা, রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল বলে পরিগণিত হচ্ছে। অভিযুক্ত এবং চিহ্নিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নির্মমভাবে কারাগারের অন্ধকারে মাসের পর মাস ফেলে রাখা হচ্ছে। গণতন্ত্রের অন্যতম মুখ্য উপাদান বাক্‌স্বাধীনতা হরণ করে মোদী সরকার নির্বিচারে সিডিশন আইন বা দেশদ্রোহিতার আইন যত্রতত্র ব্যবহার করে চলেছে।

সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় যে, ইংরেজ ঔপনিবেশিক অপশাসনকালে ১৮৩৭ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধি লিপিবদ্ধ হয়। এর মূল ভিত্তি রচনা করেছিলেন টমাস ব্যারিংটন ম্যাকলে। এর ২৩ বছর পরে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১-১৩০ ধারাগুলির মধ্যে ১২৪ ধারা অবশ্যই ছিল। বস্তুত এরও একদশক পরে ১৮৭০ সালে ধারাগুলিকে আরও কঠোর করার লক্ষ্যে ১২৪/এ ধারাটি উদ্ভাবিত হয়। এই ধারার জোরে তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া বা তাঁদের দীর্ঘকাল কারাবন্দি করে রাখা সহজতর হয়। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে সমসাময়িক কালে উগ্র ওয়াহাবি মুসলমানদের আন্দোলন মোকাবিলা করতেই ব্রিটিশ রাজ এমন আইন প্রবর্তন করে। ইংরাজ শাসকদের মনে হয়েছিল যে, এই উগ্র আন্দোলনকারীদের সশস্ত্র আক্রমণ রুখে দেবার উদ্দেশ্যেই এমন কঠোর আইন তৈরী প্রয়োজন। ইংরাজ সরকার দাবি করেছিল, ১৮৬০ সালেই নির্দিষ্টভাবে ১২৪/এ ধারাটি মূল দণ্ডবিধিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

অতীতে এই দানবীয় আইনটি ব্যবহার করেই বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বাল গঙ্গাধর তিলক এবং মহাত্মা গান্ধি সহ বহু মানুষকে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি বস্তুত বন্দি মুক্তির দাবিতে সীমিত হয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সালে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবার পরে এই আইনটির কোনো তাৎপর্য আর থাকার কথা নয়। ১৯৫৮ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টে রামনন্দন বনাম রাষ্ট্রের মামলার রায়ে ১২৪/এ ধারাটি খারিজ হয়ে যায়। পাঞ্জাব হাইকোর্টও অনুরূপভাবে এই আইন বা ধারাটি খারিজ করে। ১৯৬২ সালে সুপ্রিম কোর্ট আবার এই ধারাটি অর্থাৎ ১২৪/এ পুনসংযোজন করে। আর ১৯৭৩ সালে ইন্দিরা গান্ধি জমানায় যে দণ্ডবিধি সংশোধিত হয় তার মধ্যে ১২৪/এ ধারাটিকে বিশেষভাবে বিচার্য বলে উল্লেখ করা হয়। সকলেরই স্মরণে আছে, ওই নির্দিষ্ট সময়ে ভারত রাষ্ট্রে 'গণতন্ত্র' বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই ধারা বহন করেই ১৯৭৫ এ আপৎকালীন ব্যবস্থা বা এমারজেন্সি ঘোষিত হয়েছিল এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দেশজুড়ে দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফলস্বরূপ ইন্দিরা জমানার পতন ঘটে এবং নতুন সরকার গঠিত হয়।

বর্তমান ভারতে অঘোষিত এমারজেন্সি চলছে বা তার চাইতেও খারাপ অবস্থা। সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি একে একে অপহৃত হয়ে চলেছে। স্বৈরাচারী শাসন বললেও কিছু বলা হয় না। বস্তুত একটি ফ্যাসিবাদী প্রবণতায় চালিত দল এবং তাদের সরকার দেশের ওপর চেপে বসেছে। মোদীর ইচ্ছাই সব। সরকারের যে কোনো জনবিরোধী সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অরাজকতা, দেশের সম্পদ উগ্রতার সঙ্গে বিক্রি করে দেওয়া এবং সর্বোপরি মানুষের মধ্যে অনবরত ভীতি উৎপাদন করে মানুষকে চুপ করিয়ে রাখা চলছে। নিজেকে কোনক্রমে বাঁচিয়ে রাখাই যদি কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে, আর অন্যকিছু ভাবার অবকাশ কোথায়? সরকারের সমালোচনা, প্রতিবাদ ইত্যাদি শিকেয় তুলে সকাল থেকে রাত্রি শুধু জীবন রক্ষার তাড়নার মধ্যেই মানুষকে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র রক্তচক্ষু দেখাবে, ভয় উৎপাদন করবে এবং সন্ত্রস্ত মানুষকে একা করে বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে দেবে। গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার, দেশের সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি নিয়ে যথাযথ ভাবনার অবকাশও আর থাকছে না।

একটু খেয়াল করলেই লক্ষ করা কঠিন নয়, আর এস এস, বিজেপি কিংবা নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ প্রমুখ দেশের সব খামতির জন্য দায়ী করেন নেহরু জমানাকে। ঘুরে ফিরে পণ্ডিত নেহরুকেই কাঠগড়ায় তোলা প্রায় নিত্যকর্মে পরিণত। স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করা ইন্দিরা গান্ধির কথা বলেন না মোদী। সম্ভবত তিনিও একই স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠায় একাগ্র বলেই ইন্দিরা গান্ধি সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেন না।

পশ্চিমবঙ্গে ঠিক যেমন মমতা ব্যানার্জী তাঁর সমস্ত ব্যর্থতা গোপন করতে ৩৪ বছরের গল্প তোলেন। দীর্ঘ ৩৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গে নাকি কিছুই হয়নি। উনি ক্ষমতায় এসেই সবকিছু করেছেন। সহজে বলা যাক্, রাজ্যে কৃষকদের জীবনে সদর্থক পরিবর্তন আনতে 'ভূমি সংস্কার', লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন চাষী জমির মালিক হন নি! দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়নি। স্কুলে স্কুলে বিনি পয়সায় বই পৌঁছে দেওয়া হয়নি! কয়েক হাজার নতুন বিদ্যালয়, বহু সংখ্যক কলেজ, বেশ কয়েকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অগুনতি এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়নি! নিদেনপক্ষে দ্বিতীয় হুগলি সেতু বা বিদ্যাসাগর সেতু হয় নি এমনকি, যে নবান্ন নামের অট্টালিকায় বসে তিনি নৈরাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছেন সেই অট্টালিকাটিও হয়নি। এমন উদাহরণ অজস্র। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করে গ্রামীণ মানুষের অধিকার পরিব্যাপ্ত হয়নি আর সেই ব্যবস্থাকে দশবছরে তছনছ করে অতিকেন্দ্রিক আমলাতান্ত্রিক শাসন চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করার সুযোগও মমতা ব্যানার্জী নেন নি! মোদীজিও এমন একটা ভাব করছেন যেন ভারতে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কিছুই হয়নি।

মমতা ব্যানার্জী ক্ষমতা দখলের পরেই কলকাতার মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিংকে পরিত্যক্ত একটি বাড়িকে সচিবালয়ে পরিণত করে নতুন প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন। যত বেশি এমন সব ঘরবাড়ি নির্মিত হবে ততই কন্ট্রাক্টরের ওপর চাপ দিয়ে অবাধে তোলাবাজি চলবে। নিজের পকেটে অঢেল অর্থ আর তাদের পরিবার ফুলে ফেঁপে উঠবে।

মোদীজিও ল্যুটেন পরিকল্পিত নয়াদিল্লীর আমূল পরিবর্তনে উৎসাহী হয়ে উদগ্র আচরণ করছেন। দেশের সংসদ ভবন এবং সংলগ্ন প্রশাসনিক ভবনগুলি ভেঙে ফেলে 'সেন্ট্রাল ভিস্‌তা' নামে প্রায় কুড়ি হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে মোদী সরকার। করোনা সংক্রমণ কালে যখন মানুষ সন্ত্রস্ত অবস্থায়, প্রাণ বাঁচাতে মরীয়া, বহু কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, যখন তাঁদের সরাসরি আর্থিক সহায়তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেই সময়ে হাজার হাজার কোটি টাকার অট্টালিকা নির্মাণ প্রকল্প।

গুজরাতের কোনো এক মোদী ঘনিষ্ঠ কন্ট্রাক্টর বরাত পেয়েছে। পুরনো পার্লিয়ামেন্ট ভবন অচিরেই পরিত্যক্ত হবে এবং সেখানে হিন্দু মন্দিরের ছাঁচে এক বিশাল অট্টালিকারাজি গড়ে উঠবে। মোদী হবেন সেই চোখ ধাঁধানো বিল্ডিং কমপ্লেক্স-এর নির্মাতা। কার পকেটে কত টাকা যাবে তা নিয়ে শংকা প্রকাশে মোদী ভক্তরা সোচ্চারে বলবে নরেন্দ্র মোদী কি শুধু রামমন্দির নির্মাণ করেছেন, মোটেই না। তিনিই তো নতুন দিল্লীর স্রষ্টা।

আগামী দিনের ইতিহাসে মোদী নিজের নাম খোদাই করবেন। কত মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মারা পড়লেন, কত বেকার যুবক যুবতী কাজ না পেয়ে হাহাকার করলেন কিংবা কত সংখ্যক মেয়ের ওপর চরম শারীরিক অত্যাচার হল, তাঁরা ধর্ষিতা হলেন বা বেঘোরে প্রাণ হারালেন এসব কি আর ইতিহাসে লেখা থাকার বিষয়! ফ্যাসিবাদীরা এমন জুমলা করেই তাঁদের বিকারগ্রস্ত মানসিকতার বিস্তার ঘটান। তাঁরা শুধু পুরোনো দিনের ইতিহাস বিকৃত করেন না। তাঁরা নতুন ইতিহাস যা, তাঁদের গৌরবগাথায় পূর্ণ থাকবে তাও সৃষ্টি করে যান!

আলোচনার মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে অন্য অনেক বিষয় উত্থাপিত হল। বস্তুত, বিষয় ছিল অধুনা ভারত রাষ্ট্রের শাসকরা গণতান্ত্রিক অধিকারের মূলোচ্ছেদ করছেন কিভাবে? আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, ভারতের দণ্ডবিধিতে 'দেশদ্রোহ' অপরাধে দাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধি। মোদি সরকার তার পূর্ণতা দেবার ব্যবস্থা করেছে। কথায় কথায় বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবার লক্ষ্যেও ১২৪/এ ধারা ব্যবহৃত হচ্ছে। ইউ এ পি এ-র মতো একটি দানবীয় আইনকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে মানুষকে সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে। এন আই এ বা সন্ত্রাসবাদীদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য জাতীয় তদন্ত আইন যত্রতত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত মানবাধিকার ধ্বস্ত করা চলছে। ইতোমধ্যেই দেশে ৪৮টি এন আই এ আদালত চালু হয়েছে।

মোদী তো ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর সন্ধেবেলায় নোটবন্দির ঘোষণা করে দেশের কোটি কোটি মানুষকে বিপাকে ফেলেছিলেন। তাঁর ঘোষণা ছিল, (১) পুরনো পাঁচশ টাকা এবং এক হাজার টাকার নোট বাতিল করে ভারতে প্রচলিত কালো টাকার অর্থনীতি মুখ থুবরে পড়বে। আচ্ছে দিন আসবে। (২) পাকিস্তান থেকে রপ্তানি করা সন্ত্রাসবাদীরা বেকায়দায় পড়বে। তাদের অর্থ জোগান আর সম্ভভ হবে না। (৩) দেশ জুড়ে ইন্টারনেট ব্যাংকিং চালু হবে।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে দেখা যাচ্ছে, দেশের অভ্যন্তরে যে কালো টাকার বাড়বাড়ন্ত ছিল তার কেশাগ্রও স্পর্শ করা যায় নি। সব কালো টাকাই রিজার্ভ ব্যাংক মারফত সাদা টাকায় পরিণত হয়েছে। একজন বিশেষ অর্থবানও গ্রেপ্তার হয় নি বরং বহুসংখ্যক অঢেল অর্থের মালিক নিরুপদ্রবে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ না মিটিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। এইসব ঋণখেলাপী ব্যবসায়ীদের অনেকেই আবার মোদী ঘনিষ্ঠ। তাদের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি কোনো সদর্থক ব্যবস্থাই নেওয়া যায় নি। তারা বেশ আনন্দে বিদেশে দিনাতিপাত করছে। অর্থাৎ, কালো টাকার মালিকরা মোদী সরকারের অপার বদান্যতায় আরাম আয়েশে বিদেশে রয়েছে। সে সবের বিবরণ বিস্তারিতভাবে দেবার প্রয়োজন আর নেই। সবাই জানেন।

সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ এবং জীবনহানি ২০১৬'র পর থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। পুলোয়ামার ভয়াবহ ঘটনা তো বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগেই ঘটল। তেমনভাবে কোনো সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়ল না। বালাকোট নাটক তো বেশ রোমহর্ষক। টিভি পর্দায় আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের প্রচার হল বেশ ঘটা করে এবং মোদীর দল এসব দেখিয়ে নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গেল। শুধু সি আর পি এফ-এর কমপক্ষে চল্লিশজন জওয়ান, যাঁদের প্রাণ গেল তাঁদের পরিবারের কি হল তা আর আলোচনায় নেই! সমরবাদ কিংবা দেশের সেনাবাহিনী কেন্দ্রিক ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা পত্তনের উদগ্র অপপ্রয়াস চলছে।

৯ মার্চ ২০২০, 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৫'র তুলনায় ২০১৯ এ ইউ এ পি এ'র অবাধ ব্যবহারে ৭২ শতাংশ বেশি মানুষকে কারাবন্দি করা হয়েছে। ১২২৬ টি অভিযোগে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ১৯৪৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০১৫র পর থেকেই ভারতে দেশদ্রোহীদের সংখ্যা আতঙ্কজনকভাবে বেড়ে চলেছে! মোদী সরকার এমনই মনে করে। ২০১৯ এ মণিপুর রাজ্যে ৩০৬১ জন, তামিলনাড়ুতে ২৭০, জম্মু-কাশ্মীরে ২৫৫, ঝাড়খন্ডে ১০৫, এবং অসম রাজ্যে ৮৭টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়।

এই বছর সর্বাধিক সংখ্যক গ্রেপ্তার হন উত্তর প্রদেশে। ৪৯৮ জন যোগী সরকারের কোপানলে পড়েন। তিনি তো আবার 'মিনি মোদী'। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের বিশেষ আস্থাভাজন। উক্ত বছরে (২০১৯) মণিপুর ৩৮৬ জন, তামিলনাড়ুতে ৩০৮ জন, জম্মু ও কাশ্মীরে ২২৭ জন এবং ঝাড়খন্ডে ২০২ জনকে গ্রেপ্তার করে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়েছে। দেশের কারাগারগুলিতে উপচে পড়া ভিড়। অন্ততপক্ষে ছ মাস জেল জীবনের পরে কোনো অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করা হচ্ছে বা তা-ও হচ্ছে না। বহু সংখ্যক সুখ্যাত সমাজকর্মী, সাংবাদিক, সাহিত্যকর্মী, অধ্যাপক প্রমুখ বিনা বিচারে কারাবন্দি জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন। সে সব অবশ্য ২০২০ সালে। আর সকলের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ। লোকসভায় এসব লিখিতভাবে জানিয়েছেন মোদী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

এমন জনস্বার্থ লোপাট করে দেশের বুকে ফ্যাসিবাদী আক্রমণাত্মক শাসন জারি করতে মোদী-শাহ চক্র উদগ্র আচরণে মত্ত। দেশের মানুষকেই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তা ছাড়া পরিত্রাণ নেই।

বিধানসভা নির্বাচনে আর এস পি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য আকাশবাণীতে সম্প্রচারের জন্য

আর এস পি রাজ্য কমিটির সদস্য মৃন্ময় সেনগুপ্ত এর বক্তব্য

প্রথম পর্বের জন্য ২৪ মার্চ, ২০২১; সময় ১০ মিনিট।

সুধী নাগরিকবৃন্দ,

আর এস পি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। কঠিন আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। অর্থনীতি আজ মন্দার কবলে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লাভের গুড় যেমন কয়েকজন ধনকুবের পায়, তেমন মন্দার ফল ভোগ করে আমজনতা। তাই আজ ১ শতাংশ ধনকুবেরের পাহাড়প্রমাণ সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি অনাহার, অর্ধাহার, দারিদ্রে দিন কাটাচ্ছে দেশের কোটি কোটি মানুষ। এই রাজ্যের চিত্রও দেশের থেকে আলাদা নয়। শ্রম বনাম পুঁজির দ্বন্দ্বে রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারই পুঁজির পক্ষে কাজ করছে। সরকারের নীতিতে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টির বদলে চলছে শ্রমিক ছাঁটাই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলিতে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ হচ্ছে না। রাজ্যে শিক্ষক সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগের পরীক্ষা নিয়মিত হচ্ছে না, নিয়োগে চলছে চরম অনিয়ম। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই স্থায়ী কর্মী নিয়োগ বন্ধ করতে চায়। রাজ্যে শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তা ও অধিকার বিপন্ন। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইনগুলি বাতিল করে শ্রমবিধির মাধ্যমে অবাধে শ্রমিক ছাঁটাই, কম মজুরিতে বেশি সময় শ্রমিককে খাটানোর অধিকার মালিককে দিয়েছে। দুটি সরকারই পুঁজির স্বার্থে শ্রমের বাজার সস্তা করতে চায়। দেশের ৯০ শতাংশেরও বেশি শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত। রাজ্য সরকারও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কাজ ঠিকমতো করছে না। কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের সামাজিক সুরক্ষাগুলি কেড়ে নিতে চাইছে। আশা, আই সি ডি এস সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীরা আজও সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি পান নি। অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের প্রতি দুই সরকারেরই উদাসীনতা লকডাউনের সময়ে পরিষ্কার হয়েছে। সরকারের এই নীতি বদলাতে এবারের বিধানসভা ভোটে সংযুক্ত মোর্চা সরকার প্রয়োজন। যে সরকার প্রতি বছর চাকরির পরীক্ষা নেবে, মেধার ভিত্তিতে প্রতিটি শূন্য পদে নিয়োগ করবে। ন্যূনতম দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা বৃদ্ধি এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থে পৃথক মন্ত্রক তৈরি করবে। অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

অন্নদাতা কৃষকরা আজ বিপন্ন, বেড়ে চলেছে কৃষক আত্মহত্যা। রাজ্যের কৃষকরা ফসলের দাম পাচ্ছে না, সরকারও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বীজ, সার সহ প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ায় রাজ্যের কৃষকরা আজ দেনার দায়ে ডুবতে বসেছে। রাজ্যে অধিকাংশ ফসলের ক্ষেত্রেই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে কৃষকের থেকে ফসল কেনার যেটুকু ব্যবস্থা রয়েছে তাও ত্রুটিপূর্ণ। সরকারি ঘোষণা মতো সব ব্লকে কিষাণ মান্ডি হয় নি। যেখানে হয়েছে সেখানেও কৃষকরা বিশেষ উপকৃত হচ্ছে না। রাজ্য সরকার ২০১৪ ও ২০১৭ সালের আইনের মাধ্যমে কৃষকদের বিপন্ন করে কৃষিতে পুঁজি অনুপ্রবেশের পথ সুগম করেছে। কৃষক দেনার দায়ে জমির মালিকানা হারাচ্ছে, জমির পাট্টা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি কৃষি আইনের মাধ্যমে সমগ্র কৃষিব্যবস্থায় কর্পোরেট আগ্রাসনের পথ মসৃণ করেছে। আগামীদিনে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল কেনার সরকারি ব্যবস্থাই উঠে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন চলছে। দুটি সরকারই স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মানছে না। কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির দাপটে গ্রামীণ অর্থনীতি আজ গভীর সঙ্কটে। বাড়ছে গ্রামীণ বেকারত্ব। সংযুক্ত মোর্চা কেন্দ্রীয় কৃষি আইন এরাজ্যে কার্যকরী না করতে দেওয়া ও রাজ্য সরকারের কৃষক বিরোধী আইন বাতিলে দায়বদ্ধ। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে কৃষকের ফসলের অভাবী বিক্রি বন্ধ করে খরচের দেড়গুণ দাম পাওয়ার নিশ্চয়তা, জমির পাট্টা পাওয়া, কৃষি ও ফসল বিপণনে সমবায় ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে অন্নদাতার অন্নের নিশ্চয়তা। রাজ্যে রেগা প্রকল্পে চলছে দুর্নীতি। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে রেগা প্রকল্প তুলে দিতে চাইছে। সংযুক্ত মোর্চা চায় রেগা প্রকল্পে বছরে অন্তত দেড়শো দিনের কাজ, মজুরি বৃদ্ধি এবং শহরেও এই প্রকল্প চালু করতে।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে পেছনের সারিতে থাকা এদেশের প্রতিটি নাগরিকের পেটভরা, পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। তারজন্য রেশনের মাধ্যমে সকলের সুষম খাদ্যপণ্যের নিশ্চয়তা প্রয়োজন। অথচ, রাজ্য সরকার রেশনে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ কমিয়েছে। ডিজিটাল রেশন কার্ডের নামে চলছে ভেদাভেদ ও অনিয়ম। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি আইনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও রেশন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে চাইছে। খাদ্য সুরক্ষা আইনও লঘু করার চেষ্টা চলছে। আধার সংযোগসহ নানা নিয়মের বেড়াজালে কোটি কোটি মানুষকে রেশন ব্যবস্থা থেকে সরকার ছেঁটে ফেলতে চায়। পাশাপাশি সংযুক্ত মোর্চা চায় রকমারি কার্ডের নামে ভেদাভেদ নয়, সকলের জন্য রেশন। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে ২ টাকা দরে মাসে পরিবার পিছু ৩৫ কেজি চাল বা আটা, বাজার থেকে কম দামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা।

রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের আয় কমছে, জিনিসের দাম বাড়ছে। রাজ্য সরকার দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন বদলে কেন্দ্রীয় সরকার কালোবাজারি ও মজুতদারিকে অবাধ করেছে। খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে চলেছে। কেন্দ্রের নীতিতে পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে। তৃণমূলের আমলে রাজ্যে বিদ্যুতের দাম বহুগুণ বেড়েছে। কেন্দ্রের নয়া বিদ্যুৎ আইনে বেসরকারিকরণ ও দাম বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছে। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা, ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকি। করোনা অতিমারি প্রমাণ করেছে যে, সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব না নিলে, স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ উৎসাহিত হলে মানব সভ্যতাই বিপন্ন হবে। সরকারি উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। অথচ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জনস্বাস্থ্যকে অবহেলা করে, বীমার মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাগুলির লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে। সংযুক্ত মোর্চা চায় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সরকারি উদ্যোগ, বিনামূল্যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ।

শিক্ষার অধিকার ও মানের বৈষম্য বেড়ে চলেছে। বেসরকারিকরণের ফলে শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার প্রধান যোগ্যতা এখন আর্থিক ক্ষমতা। রাজ্য সরকার শিক্ষক নিয়োগ না করায় এবং পরিকাঠামোর অভাবে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার মানের অবনতি হচ্ছে। কেন্দ্রের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বেসরকারিকরণ ও কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে সেই বৈষম্যকেই বাড়িয়ে তুলবে। কেন্দ্রের বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ কমেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। ক্যাম্পাসে মুক্ত চিন্তার, গণতন্ত্রের পরিবেশ আজ বিপন্ন। রাজ্যে ছাত্র সংসদের অধিকার থেকেও ছাত্রসমাজ বঞ্চিত। ফি নিয়ন্ত্রণে সরকার কোনো ভূমিকাই পালন করছে না। সংযুক্ত মোর্চা রাজ্য বাজেটের অন্তত ২০ শতাংশ শিক্ষায় বরাদ্দ করতে এবং ফি নিয়ন্ত্রণ করতে দায়বদ্ধ। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে ক্যাম্পাসে মুক্ত চিন্তা ও গণতন্ত্রের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা।

প্রাকৃতিক সম্পদে পুঁজির আক্রমণ পরিবেশ ধ্বংস করে দিচ্ছে। জল, জমি, জঙ্গল, খনিতে জনসমাজের অধিকার থাকছে না। পরিবেশ ধ্বংস করে তথাকথিত উন্নয়ন বা বিকাশ মানব সভ্যতাকেই বিপন্ন করে। সংযুক্ত মোর্চা রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করে পরিবেশ বান্ধব সর্বজনীন উন্নয়নে দায়বদ্ধ।

বন্ধুগণ, নীতির প্রশ্নে তৃণমূল ও বিজেপি'র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে দলবদলের খেলা নয়, নীতি বদলের লড়াই। জাতের লড়াইকে পরাস্ত করে রুটি রুজির লড়াইকে শক্তিশালী করতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আর এস পি প্রার্থীদের কোদাল ও বেলচা চিহ্নে এবং রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রে বাম-কংগ্রেস- ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি নিয়ে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করার জন্য আর এস পি'র পক্ষ থেকে আপনাদের আবেদন জানাচ্ছি।

হুগলী জেলায় নির্বাচনী কর্মসূচি

হুগলী জেলায় সংযুক্ত মোর্চার সমর্থনে চলছে প্রচার কর্মসূচি। আর এস পি'র পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে একক ও যৌথ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা হচ্ছে।

১৩ মার্চ চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে আর এস পি'র কর্মীসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংযুক্ত মোর্চার ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী কম. প্রণব ঘোষ, আর এস পি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. কিশোর সিং, লোকাল সম্পাদক কম. অরুণ দাস, কম. চম্পা বসাক, কম. শেখ শাজাহান, কম. অনিরুদ্ধ দাস, কম. ক্রান্তি মুখার্জি, কম. শিবনাথ সাহা প্রমুখ। ১৯ মার্চ চুঁচুড়া সদর মহকুমার কেন্দ্রগুলির মোর্চা প্রার্থীরা মিছিল সহযোগে মনোনয়নপত্র জমা দেন। উপস্থিত ছিলেন সি পি এম জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. মনোদীপ ঘোষ, ফরওয়ার্ড ব্লক জেলা সম্পাদক কম. সুনীল ঘোষ, আর এস পি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. কিশোর সিং, কম. চম্পা বসাক, লোকাল সম্পাদক কম. অরুণ দাস প্রমুখ। ২১ মার্চ ব্যান্ডেল মোড় থেকে চুঁচুড়া ঘড়ির মোড় পর্যন্ত মিছিল হয়। মিছিল শেষে ঘড়ির মোড়ে সভায় বক্তব্য রাখেন সি পি এম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, আর এস পি জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী কম. প্রণব ঘোষ প্রমুখ। ১৬, ১৮, ১৯ নং ওয়ার্ড সহ চুঁচুড়ার বিভিন্ন এলাকায় আর এস পি'র পক্ষ থেকে দেওয়াল লেখা, ফ্লেক্সের মাধ্যমে প্রচার চলছে।

৯ মার্চ খানাকুল বিধানসভায় সংযুক্ত মোর্চার মহামিছিল হয়। মিছিল শেষে ব্লক মোড়ে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সি পি এম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. সুজন চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদক কম. দেবব্রত ঘোষ, আর এস পি জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত প্রমুখ। ১৯ মার্চ খানাকুল বাসস্ট্যান্ডে আর এস পি'র পক্ষ থেকে নির্বাচনী সভা হয়। বক্তব্য রাখেন আর এস পি জেলা কমিটির সদস্য কম. বিপ্লব মজুমদার, সংযুক্ত কিষাণ সভার কম. যাদব বাগ, আর ওয়াই এফের কম. ভাস্কর চক্রবর্তী, সি পি এম এরিয়া সম্পাদক কম. ভজহরি ভুইঞা, মোর্চার আই এস এফ প্রার্থী ফয়সাল খান প্রমুখ। ২৪ মার্চ খানাকুলের শাবলসিংহপুর মাঠে জনসভা হয়। বক্তব্য রাখেন সি পি এম জেলা সম্পাদক কম. দেবব্রত ঘোষ, আর এস পি'র জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত সহ জাতীয় কংগ্রেস, আই এস এফের নেতৃবৃন্দ। খানাকুল ও পুরশুড়া বিধানসভায় প্রার্থীদের নিয়ে প্রচারেও আর এস পি'র পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। পুরশুড়া বিধানসভায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন কম. কৌশিক ভৌমিক, কম. অরুণ কাঁড়ার প্রমুখ।

১২ মার্চ শ্রীরামপুরের ১৩ ও ১৭ নং ওয়ার্ডে আর এস পি'র উদ্যোগে সংযুক্ত মোর্চার নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। ১৯ মার্চ শ্রীরামপুর মহকুমার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের মোর্চার প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল সহযোগে মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়। মিছিলে প্রার্থী কম. মহ. সেলিম, আব্দুল মান্নান, জেলা বামফ্রন্ট আহ্বায়ক কম. সুদর্শন রায়চৌধুরী, সি পি এম জেলা সম্পাদক কম. দেবব্রত ঘোষ, সিপিআই জেলা সম্পাদক কম. তিমির ভট্টাচার্য, আর এস পি জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত আর এস পি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. সত্যজিৎ দাশগুপ্ত, কম. কালাচাঁদ ব্যানার্জী, কম. ভবতোষ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরামপুরে আর এস পি'র পক্ষ থেকে মোর্চার জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং চলছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসে হুগলী জেলায় মহিলা সমাবেশ

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসে শ্রীরামপুরের গান্ধী ময়দানে বাম ও কংগ্রেস মহিলা সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে জেলা মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কম. কনীনিকা ঘোষ, নিখিল বঙ্গ সংঘের রাজ্য সম্পাদিকা কম. সর্বানী ভট্টাচার্য প্রমুখ। কম. সর্বানী ভট্টাচার্য দিবসটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, শ্রমজীবী মহিলারা আজও কর্মস্থলে বঞ্চনার শিকার। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের নানাভাবে অত্যাচার করা হয়। অসংগঠিত ক্ষেত্রের নারী শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয়। দেশ তথা রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতন ও গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনা বেড়ে চলেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকার তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। সমাবেশের পরিচালকমণ্ডলীতে নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের পক্ষ থেকে ছিলেন জেলা সম্পাদিকা কম. চম্পা বসাক।

মুক্তিযুদ্ধের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা আজও বাংলাদেশের খেটেখাওয়া মানুষের সংগ্রামী প্রেরণা

অশোক ঘোষ

''বুকের মাঝে সমস্ত রাত
আলোয় আলোয় মুখখানি তার
হাজার হাজার শক্ত মুঠোয়
ভাঙছে এবার বন্ধ দুয়ার।
বুকের ভেতর বারুদ জমেছে
নিশানা ধরো সামনে কেউ
সূর্যের খোঁজে এপার ওপার
গঙ্গার বুকে পদ্মার ঢেউ।''

সত্তর দশকের শেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে এপার বাংলার ছাত্র আন্দোলনের একজন রাজনৈতিক কর্মীর অনুভব ও আবেগের প্রকাশ ঘটেছিল উপরিউক্ত পংক্তিগুলিতে।

ষাটের দশক দুনিয়া কাঁপানো যৌবনের দশক। বাঁধভাঙা বন্যার মতো এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে শোষণ ও বঞ্চনার অবসানের উত্তাল সংগ্রামে 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে যৌবন পথে নেমেছে। কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে শামিল হয়েছে ছাত্র-যুব সমাজ। দেওয়ালে দেওয়ালে চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রো, হো চি মিন, জেনারেল গিয়াপ আর মাও সে তুং-এর ছবি। সেই সময় মাথা উঁচু করে গ্রাম, নগর, মাঠ, প্রান্তর, বন্দরে উদ্বেল হয়ে উঠলো বাংলা ও বাঙালি। অধিকার কেড়ে নেওয়ার সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন শেখ মুজিবর রহমান। আর এপার বাংলার প্রতিটি ঘরেও সেই আহ্বান পৌঁছে গিয়েছে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখলে এই সংগ্রাম ছিল বাঙালির স্বাভিমান প্রতিষ্ঠা, সমতা ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। শোষণ ও বঞ্চনার অবসানের অভিমুখে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছিল এই সংগ্রাম। স্বাধীন বাংলাদেশ হলো আন্তর্জাতিক দুনিয়াতে বাঙালির দুর্দম প্রাণশক্তির আত্মপ্রকাশ। তখন বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে সোচ্চার এপার বাংলা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ও আত্মত্যাগের ইতিহাস বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা। কোটি কোটি শ্রমজীবী জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও শহিদের মৃত্যুবরণে এই সংগ্রাম হয়েছে মহান। স্বাধীন বাংলাদেশ সদর্পে ঘোষণা করেছিল, 'রাষ্ট্রের আদর্শ হবে সমতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সহনশীলতা ও গণতন্ত্র।' বিশ্বের সর্বত্র যেখানেই বাঙালি আছেন, তাদের সকলের গর্বের দেশ হয়ে উঠল বাংলাদেশ। গত অর্ধ শতকের বাঙালির শ্রেষ্ঠ আইকন হলেন বঙ্গবন্ধু।

স্বাধীন বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশের পরে পাঁচ দশক অতিক্রম হলো। আর্থ-সামাজিক বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। একুশ শতকে প্রবেশের পর অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে অনুভব হচ্ছে, এই উপমহাদেশ আজ আদর্শগত বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে। ১৯৭২ সালে নভেম্বর মাসে ঢাকায় বাংলাদেশের আইনসভায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সংবিধান গ্রহণের সময় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, '...আমরা ধর্মাচরণ বন্ধ করব না... আমাদের আপত্তি শুধু ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে।' অর্থাৎ রাষ্ট্র কোন মানুষেরও ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করবে না। বেদনার হলো এই উপমহাদেশে এই নীতি ও আদর্শ বড় রকমের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু আরও বলেছিলেন, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের অন্য সমস্ত নাগরিকের সমানাধিকার ও সুযোগ ভোগ করার স্বত্ব থাকা চাই।' বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা উপমহাদেশের ক্ষেত্রে আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই ঘোষণার সঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতাও সম্পৃক্ত। আজ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে এই উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা। রাষ্ট্রের উন্নয়নের কর্মসূচির সফলতা নির্ভর করে গণতন্ত্রের বিকাশের উপর।

গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন যে কোনও নাগরিকের উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো পরিস্থিতি বিদ্যমান। সত্তরের মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণের রক্তাক্ত ইতিহাস আজও স্মরণীয়। স্বাধীনতার অর্ধশতক পরে রাষ্ট্রের উদ্যোগেই 'স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির অবদান' শীর্ষক ইতিহাস রচনা প্রয়োজন। এই উপমহাদেশে শ্রমিক শ্রেণির অবদান অস্বীকৃত।

উপমহাদেশের শ্রমজীবী জনসাধারণ আজ বিপন্ন। জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা থাকছে না। মানুষে মানুষে আয়ের ব্যবধান (ইনকাম গ্যাপ) দ্রুত বেড়ে চলেছে। জাতীয় বেতন নীতি নেই। শ্রম আইনের আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে আইন সংশোধনে কাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে? শ্রমিক-কর্মচারীরা কি প্রকৃতই আইনের সুযোগ পাবেন? বিচার ব্যবস্থার প্রতি কেন সাধারণ মানুষ আস্থা হারাচ্ছেন? কর্পোরেটে পুঁজির দাপটে শিল্প, শ্রমিক ও দেশ বিপন্ন। এই উপমহাদেশে সর্বত্র সস্তার শ্রমিক পাওয়া যায় বলেই সাম্প্রতিককালে পোশাক শিল্পের বিস্তার ঘটেছে। এখানে নারী শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্য। ন্যূনতম বেতন নেই, দেশের আইনেরও কার্যকর প্রয়োগ হয় না। নারী শ্রমিকেরা শারীরিক ও মানসিক ভাবেও শোষিত।

গত দুই শতাব্দীর বেশি সময়কাল পুঁজিবাদ বহু আর্থ-সামাজিক উত্থান-পতনের পথে চলতে চলতে শোষণের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ওয়ার্ল্ড ট্রেডস অর্গানাইজেশন) গড়ে ওঠার পর মুক্ত বাণিজ্য বা ফ্রি ট্রেড-এর মাধ্যমেই পুঁজিবাদ সংকটমুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুক্ত বাণিজ্য কার্যত এমন এক ধরনের উপনিবেশ গড়ে তুলতে চায়, যেখানে পুঁজির নিরাপত্তা থাকবে এবং কোনও একটি দেশের শাসনক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ না করে পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর নজরদারি করা যায়। প্রক্রিয়া-পদ্ধতিরও কাঠামোগত যে পরিবর্তন ঘটুক না কেন, একবিংশ শতাব্দীতে পুঁজি ও আধুনিক উপনিবেশবাদের প্রধান চালিকাশক্তি ফ্রি ট্রেড বা মুক্ত বাণিজ্য। উন্নয়নশীল দেশগুলি আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়ার কারণে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির ওপরে নির্ভর করছে। বিশ্ব পুঁজিবাদ সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলিকে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে পরিণত করেছে। অবাধ বাণিজ্য ও পুঁজির নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রধানতম লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কোর কনভেনশনগুলি যথাক্রমে 'সংঘ, সংগঠন ও সমাবেশের অধিকার, দর কষাকষির অধিকার, মৌলিক অধিকার সমূহের সুরক্ষা, ডিসেন্ট ওয়ার্ক ইত্যাদি আজ নয়া উদারবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় উপেক্ষিত। দেশি ও বিদেশি পুঁজিপতিদের জন্য লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে গিয়েই রাষ্ট্র শ্রমজীবী জনসাধারণের মৌলিক অধিকারগুলি কেড়ে নিচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গঠনের ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতা নিশ্চয়ই এই উপমহাদেশকে যে শিক্ষা দিয়েছে, তা হল বাংলাদেশের জন্ম মহম্মদ আলি জিন্না ও মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্বের 'অ্যান্টি-থিসিস'। কারণ জাতীয়তাবাদের ও জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি ধর্মের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠতে পারে না। এই সত্যের বিপরীতে চলতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানের শাসকবর্গ। তাই যার যা আছে তাই নিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের মরণপণ স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়, আমেরিকার মদতপুষ্ট পাকিস্তান পিছু হঠতে বাধ্য হয়। কার্যত যে ভুল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশভাগের মধ্য দিয়ে ঘটেছিল, পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ ও ভারত সকলেই সেই ঐতিহাসিক ভুল সংশোধনের সংগ্রামে সামিল হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আবশ্যিক পরবর্তী ধাপ ছিল ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্ধশতক ও বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষে শ্রমিক শ্রেণি অনুভব করছে স্বাধীনতার ঘোষণা সমূহ যথাযথ মর্যাদা সহ কার্যকর হোক। ভারতের শ্রমজীবী জনগণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতি সংগ্রামী অভিনন্দন ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি। শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিক ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক।

মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী ও আজকের প্রেক্ষিত

৩-এর পাতার পর

সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তুলে ধরতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা এই কাজটি শুরু করতে পেরেছিলেন সেদেশের মুক্তবুদ্ধির বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায়। পরবর্তীকাল খালেদা জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন বরিশালের শান্তি কমিটির প্রধান আবদুর রহমান বিশ্বাসকে সে দেশের রাষ্ট্রপতি করে। জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম শীর্ষ নেতা মতিউর রহমান নিজামীকে সেদেশে কৃষিমন্ত্রী করে। তা ছাড়াও আরো বহু যুদ্ধাপরাধীকে, ঘাতক দালালকে নানানভাবে সামাজিক পুনর্বাসন দেয়। সেই সময় থেকেই এই ঘাতক-দালালদের বিচারের দাবিতে বাংলাদেশ একটা নতুন পর্যায়ের সামাজিক আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তোলে। আন্দোলন সংঘটিত হতে শুরু করে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সংগঠিত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন শহিদ জননী জাহানারা ইমাম। নেতৃত্বের ভার জনগণ বঙ্গজননী কবি সুফিয়া কামালের উপর অর্পণ করতে চাইলেও, সুফিয়া কামাল বলেন;আমি আন্দোলনের সঙ্গে সর্বাত্মকভাবে আছি। কিন্তু আন্দোলনের নেতৃত্ব দিক জাহানারা।

একাত্তরের ঘাতক-দালালদের বিচারের দাবিতে সংগঠিত ঘাতক দালাল নির্মূল ও একাত্তরের চেতনা বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটি গোটা বাংলাদেশের কার্যত মুক্তিযুদ্ধের একটি দ্বিতীয় পর্যায়ে সৃষ্টি করেন। বিরানব্বই সালের ২৬ মার্চ কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে, নুরেমবার্গের গণআদালতের আদলে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী ময়দানে ঐতিহাসিক গণআদালত সংঘটিত হয়।

তার আগে যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল গণতদন্ত কমিশন। এই সমস্ত কাজেই সুফিয়া কামাল, কবীর চৌধুরী, আহমেদ শরীফ, শামসুর রহমান, পান্না কায়সার, শমী কায়সার, সৈয়দ হাসান ইমাম, অনুপম সেন, দেবেশ ভট্টাচার্য, কলিম শরাফী প্রমুখ মুক্তবুদ্ধির বুদ্ধিজীবীরা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

খালেদা জিয়ার সরকার বাংলাদেশের এইসব সোনার সন্তানদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা পর্যন্ত এনেছিল। দেশদ্রোহিতার সেই মামলা মাথায় নিয়েই শহিদ জননী জাহানারা ইমামের জীবনাবসান হয়। নির্মূল কমিটির এই গণআন্দোলন কার্যত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে পুনঃস্থাপিত করবার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রদায়িকতার পথ থেকে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষতায় উপস্থাপিত করতে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি পুনঃস্থাপিত করতে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমন ভূমিকা সাম্প্রতিক অতীতে কোনো দেশে, কোনো বুদ্ধিজীবীদের ভেতর দেখতে পাওয়া যায়নি। আজ শেখ হাসিনা সে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে যে ধরনের পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হন, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে যে আন্তরিকতার পরিচয় দেন, তার ভিত্তিভূমিকে বাস্তবের উপর নির্মাণ করার ক্ষেত্রে তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যেমন ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে, তেমনি আছে সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান প্রমুখ মুক্তবুদ্ধির পান্থজনের প্রভাব।

আজকের বাংলাদেশকে বিনষ্ট করতে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উৎখাত করতে, সে দেশের ভেতরে একটা শক্তি অত্যন্ত সক্রিয়। মূলত পাকিস্তানের মদতে বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মৌলবাদীরা গোটা দেশটাকে ধর্মান্ধতার মোড়কে আবৃত করে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করে দিতে সচেষ্ট। এই তৎপরতার পিছনে শেখ হাসিনার সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রটি অত্যন্ত প্রবল। কারণ, মৌলবাদীদের কাছে শেখ হাসিনা বা তাঁর সরকারের ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সবথেকে আপত্তির কারণ।

তাই এত প্রতিবন্ধকতার ভেতরেও, একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার বিজয় বৈজয়ন্তীটিকে বজায় রাখা অপরদিকে পদ্মাসেতুর বাস্তবায়ন সহ আধুনিক পথে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা, এই উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, এইসবের ভেতর দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী, বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আজকে নতুনভাবে বাংলাদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরছে।

Vol. 68 Issue No. 31 শনিবার ২৭ মার্চ ২০২১ আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

২৩ মার্চ '২১ দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে সম্প্রচারের জন্য

আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য'র বক্তব্য

এমন ঘোর দুঃসময় স্বাধীনোত্তর ভারতে কোনকালেই আসেনি। মানবিকবোধ সম্পূর্ণভাবে বর্জিত একটি রাষ্ট্রীয় সরকারও কোনদিন ভারত শাসনের দায়িত্ব পায়নি। দেশের ব্যাপক সংখ্যক বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন হতাশাজনিত নৈরাশ্যের অন্ধকারে আলোর দিশা খুঁজতে উদ্গ্রীব। সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত। করোনা ভাইরাসের মারণ কামড় এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অপরিকল্পিত এবং চমকসৃষ্টিকারী লকডাউন মানবিক সংকটকে গভীরতর করেছে। বহু লক্ষ মানুষের হৃদয়বিদারক মৃত্যু গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সেটাই বর্তমান নৈরাশ্যের একমাত্র কারণ নয়। করোনাকালের আগেই ভারতের অর্থনীতি যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে অবনমিত। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে ২০১৬ সালে নোটবন্দি এবং পরবর্তীকালে চমক দেবার লক্ষ্যে জিএসটির প্রচলন সারা দেশে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে গভীর সমস্যা নির্মাণ করেছে। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালেই কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বিপুল বেগে বাড়তে শুরু করে। বেকারত্বের হার ও সংখ্যা উভয়ই অতীতের সমস্ত নজির ছাড়িয়ে যায়। প্রত্যেক বছর দুই কোটি নতুন কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি একান্ত প্রবঞ্চনা বা ধোঁকা বলেই প্রমাণিত হয়। দীর্ঘ প্রায় এক বছরের করোনা সংক্রমণ এই সমস্যাকে আরও ভয়ঙ্কর এক সমস্যায় পরিণত করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য পরিসংখ্যান থেকেও এমন সাংঘাতিক বেকারত্বের সমস্যা সম্পর্কে বোঝা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার নানা কারসাজি করেও সত্য গোপন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রধান ব্যক্তিত্বরা যে প্রতিশ্রুতি নির্বাচনের প্রাক্কালে দেন তার কোনোটাই পূরণ করেন না। বিগত দশ বছর যাবৎ আমরা এমন অভিজ্ঞতাই অর্জন করছি। এরপরেও তাঁরা অনেক কিছু করে দিয়েছি বলে অনবরত মিথ্যা দাবি করেন। ইদানীংকালে কেন্দ্র এবং রাজ্য প্রধানদের মধ্যে এক নজির সৃষ্টিকারী মিথ্যা কথার প্রতিযোগিতা চলছে। এসবের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের অপকর্মগুলি চালিয়ে যাবার লক্ষ্যেই এঁরা চলছেন। এদের উভয়েরই মূল লক্ষ্য ভারতের বড় বড় কর্পোরেট কোম্পানিগুলির অতিমুনাফা অর্জনে সহায়তা করা। বস্তুত কেন্দ্রের সরকার প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ বিশেষ বিত্তশালীদের যে কোনো প্রয়োজন পূরণে এক পায়ে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

দিল্লির রাজপথে যে অগণিত কৃষক সমস্ত ধরনের অত্যাচার ও বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তা, অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেট বান্ধব ভূমিকার বিরুদ্ধেই। ইতোমধ্যে তিনশর ওপরে আন্দোলনকারী শহিদ হয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে দিল্লির রাজপথ খুঁড়ে গভীর পরিখা নির্মিত হয়েছে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মতো পথে পথে বড় বড় পেরেক পুঁতে এবং কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সহিংস বিরুদ্ধাচরণ শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ কর্পোরেট কোম্পানির স্বার্থেই করা হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে দেবার কোনো কারণ নেই। দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারই নয়, বাস্তবে মানবিক অধিকার পর্যন্ত জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। এ লজ্জা রাখি কোথায়?

আরও বিশেষ আতঙ্কের প্রসঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো সমালোচনা বা বিরুদ্ধ মতকে স্তব্ধ করতে অতি তৎপর। প্রতিষ্ঠিত সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সমালোচনামূলক অবস্থান নিলেই তাঁকে বা তাঁদের দেশদ্রোহী বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিনা বিচারে বিভিন্ন কারাগারে জামিন অযোগ্য ধারায় অভিযোগ এনে বছরের পর বছর নিপীড়ন করা হচ্ছে। মাত্র কিছুদিন আগেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষে নির্দিষ্টভাবে লোকসভায় স্বীকার করা হয়েছে যে, বিগত ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে দানবীয় ইউ এ পি এ আইনে গ্রেপ্তার বেড়েছে ৭২ শতাংশ।

ইউ এ পি এ এবং এন আই এ-র অনৈতিক প্রয়োগে যে কোনো প্রতিবাদকারীকে বন্দি করা চলছে। ফ্যাসিবাদী কায়দায় চলছে দেশের সরকার। দেশজুড়ে ৪৮টি বিশেষ আদালত স্থাপন করেছে এন আই এ। সন্ত্রাসবাদী বলে বহু রাজনৈতিক বিরোধী মানুষকেও দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র ২০১৯ সালেই ১৯৪৮ জনকে ইউ এ পি এ প্রয়োগ করে বন্দি করা হয়েছে। বহু প্রখ্যাত সমাজকর্মী, শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক এবং গণ আন্দোলনের কর্মীদের নির্বিচারে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে আবদ্ধ করা চলছে। সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে সমালোচনা কখনোই দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য হতে পারে না। ইংরেজ আমলের জনস্বার্থ বিরোধী আইন ব্যবহার করে জনমানসে ভীতির সঞ্চার করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে নিরবচ্ছিন্নভাবে তা হয়ে চলেছে।

২০১১ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গেও তৃণমূল সরকারের পুলিশ হাজার হাজার বামকর্মীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মিথ্যা অভিযোগে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। এখনও বহু নিরপরাধ মানুষ বন্দি জীবনযাপন করছেন। কেউ কোনো প্রশ্ন করলেই তাঁর বিরুদ্ধে ফরমান জারি হয়। কলেজ ছাত্রী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বা ক্ষুদ্র চাষী যেই হোক্, কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। ফ্যাসিবাদের বিস্তার সম্ভব করতে সাধারণ মানুষের মনে ভীতিসঞ্চার করা একটি সহজ এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। স্বেচ্ছাচারী বা গণতন্ত্র নিধনকারী সরকার সেই অপকর্মটি করেই চলে। অন্যান্য বহু গুরুতর অভিযোগ থাকলেও শুধুমাত্র এই একটি কারণেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে এই তৃণমূল কংগ্রেস দলের কোনো নৈতিক অধিকার নেই মানুষের কাছে সমর্থন চাওয়ার। এই দলটির সরকার নির্দিষ্টভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতির মর্মবস্তু বিধ্বস্ত করেছে। মাফিয়া রাজের অবাধ বিস্তার ঘটিয়েছে। দুর্নীতির বিস্তার ঘটিয়ে চরম নৈতিক অপরাধ করেছে। এই রাজ্যে এমন রাজনৈতিক পরিস্থিতি আজ থেকে দশ এগারো বছর আগে কল্পনাও করা যেত না। সর্বোপরি তৃণমূল কংগ্রেসই এই রাজ্যে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে ডেকে এনেছে। এখনও এই দলটির নানাস্তরের নেতারাই বিজেপির সম্পদ বলে বিবেচিত। দল বদলের এমন ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি বরদাস্ত করা নৈতিক দিক থেকে গর্হিত অপরাধ।

তৃণমূল কংগ্রেস নেতা নেত্রীদের বিরুদ্ধ দুর্নীতিযোগ নিয়ে অসংখ্য অভিযোগ। কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের সঙ্গে গভীর সংযোগ রেখে সিবিআই-ইডি তদন্ত প্রভাবিত করা হচ্ছে। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, এই দু'টি চরম দক্ষিণপন্থী দলই একে অন্যের পরিপূরক। বস্তুত, তৃণমূল কংগ্রেসই উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি'র প্রধান সহায়। সুতরাং, বিজেপিকে রুখতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করতেই হবে। নির্বাচনের আগেই তৃণমূল বিজেপি একাকার হয়ে গেছে। ভোটের ফল প্রকাশ হবার পরে যে দুজনে মিলিতভাবে জনবিরোধী সরকার আমাদের ওপর চাপিয়ে দেবে না তার গ্যারান্টি কোথায়?

নারী নির্যাতনের প্রশ্নেও তৃণমূল সরকার ও উত্তর প্রদেশ, ত্রিপুরা প্রভৃতি বিজেপি শাসিত রাজ্যের কোনো প্রভেদ নেই। লাগাতার নারী সমাজের ওপর বিশেষত, সমাজের পশ্চাদপদ অংশের মেয়েদের ওপর চরম অত্যাচার চলছে। পশ্চিমবঙ্গে অনেককাল ধরে চলে আসা পাপ এখন অন্যান্য রাজ্যেও আতঙ্কজনকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই অমানবিকতার প্রতিবিধান করতেই হবে।

পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসও নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গে জাতপাত ও সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনীতির প্রসার ঘটিয়েছে। কখনো জনজীবনের সর্বজনীন ও মৌলিক উন্নয়নের পথে চলেনি। শুধুমাত্র চমক দেবার লক্ষ্যে ক্রিয়াশীল থেকেছে। মানুষের অধিকার লুণ্ঠন করে কোনো কোনো সময় ওরা ভিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছে। গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি কোনোভাবে মেনে নেওয়া হয়নি। ব্যাপক বেকারত্ব রাজ্যের যুব জীবনে চরম হতাশার সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি, সাধারণ প্রশাসন, নারী সমাজের নিরাপত্তা ইত্যাদি সবকিছুই এই দেশে ও রাজ্যে চরমভাবে অবহেলিত। পেট্রোল-ডিজেল-কেরোসিন তেল সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশচুম্বী। এর জন্য মুখ্যত দায়ী অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু রাজ্য সরকারও তাদের দায় এড়াতে পারে না। ভেতর থেকে ফাঁপা একটি চমক প্রধান সাদা নীল রং-এর অট্টালিকাই জনস্বাস্থ্যের সুচারু ব্যবস্থা বলা যায় না। সাধারণ মানুষ যন্ত্রণাদায়ক প্রতারণার মুখে।

আমরা রাজ্য বামফ্রন্ট এবং সম্প্রসারিত সংযুক্ত মোর্চার পক্ষে রাজ্যবাসীর কাছে বিনম্রভাবে আবেদন করছি যে, বর্তমান নীচতা এবং জনগণকে প্রতারিত করার পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিন বদলের ব্যবস্থা করতেই হবে। বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে আসন্ন নির্বাচনে পরাস্ত করে সংযুক্ত মোর্চার সরকার গঠনই আমাদের লক্ষ্য। তৃণমূল ও বিজেপি এই দু'টি দলই গণতন্ত্রের সর্বনাশ করছে। এই দু'টি দলই সাধারণের মধ্যে অসহিষ্ণুতার বিষাক্ত পরিবেশ নির্মাণ করেছে। বিজেপির ছদ্মজাতীয়তাবাদ এবং গৈরিক বাহিনীর দুর্বৃত্তদের সহায়তায় হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান নির্মাণের উদ্দেশ্য বানচাল করতেই হবে। মানুষের জয় ছিনিয়ে আনতেই হবে।

বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহার

প্রকাশিত হয়েছে — দাম ৫ টাকা

কর্পোরেট স্বার্থে তৃণমূল ও বিজেপি'র ঘৃণ্য চক্রান্ত রুখতে মানুষের স্বার্থে বামগণতান্ত্রিক ঐক্য সুদৃঢ় করুন

প্রকাশিত হয়েছে — দাম ১০ টাকা

বামপন্থা-সেকাল একাল

—মনোজ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে

—— দাম ১৫ টাকা——

অবিলম্বে সংগ্রহ করুন

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-